প্রস্তাবনা

সুজলা-সুফলা পশ্চিমবঙ্গ উদ্যানজাত ফসল উৎপাদনে সারা দেশে অগ্রণী। বিভিন্ন ফল, ফুল, সব্জী, মশলা, ওষধি ও সুগন্ধী উদ্ভিদের এই ক্ষেত্রটি পুষ্টি সুরক্ষা প্রদান, একক জমিতে বেশী উপার্জন, বিভিন্ন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কাঁচামালের যোগানের মাধ্যমে রাজ্যের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করে।

উদ্যানপালন ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের সফল রূপায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি ও জীবন জীবিকার উন্নয়ন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে অগ্রণী আসনে আসীন করতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ বদ্ধপরিকর।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী উদ্যানপালন ক্ষেত্রের ফসলকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ক্ষেত্রের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে এই দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে সেতুবন্ধনের মাধ্যমে রাজ্যের গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়ন এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে স্বপ্ন দেখেছেন, তাঁর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের এটি একটি ক্ষুদ্র উদ্যোগ।

উদ্যানজাত ফসলের চাষ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা এবং এ সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার বিভিন্ন মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকা তথ্যাবলি একত্রিত করে উদ্যোগী কৃষক বন্ধু এবং ছোট-বড় উদ্যোগপতিদের কাছে এই সব তথ্য সহজলভ্য করে তোলার একটি প্রায়াস এই প্রচার পুস্তিকা।

পারভেজ আহমেদ সিদ্দিকি
সচিব
খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচীপত্র

পশ্চিমবঙ্গের উদ্যানপালন	১
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন ২০১৮-১৯	৩
সুসংহত উদ্যানপালন উন্নয়ন মিশনের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমূহ	৭
সুসংহত উদ্যানপালন মিশন / রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা প্রকল্প রূপায়নের নিয়মাবলী	৯
ফল ও সব্জীর সুসংহত সংরক্ষণ ব্যবস্থা সমূহ- সহায়তা প্রকল্প	১১
টিস্যু কালচার কলার চাষ	১২
ড্রাগন (ফ্রুট) ফলের চাষ	১৪
পেয়ারা চাষ	১৬
উন্নত উপায়ে ব্রোকলি চাষ	১৮
কেঁচো সার উৎপাদনের উন্নত পদ্ধতি	২২
খরিফ পেঁয়াজ চাষ	২৬
স্বল্পমূল্যের পেঁয়াজ সংরক্ষণ কাঠামো	২৮
পেঁপে চাষ	৩০
কাজু বাদাম চাষ	৩২
নারকেল চাষ	৩৪
ছায়াজালের ঘরে ফসল চাষ	৩৮
ছায়াঘরে (Shade Net) পান চাষ	৪০
সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ভেষজ অধিকারের কার্য্যাবলী	৪২
পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প	৪৩
কৃষিজ ও উদ্যানপালন ভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করা যেতে পারে	৪৬
বেকারী এ্যান্ড কনফেকসনারী	৪৮
পটেটো ফ্লেক্স	৪৯
দুগ্ধজাত শিল্প	৫০
মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ	৫১
রাইস মিল বা চাল কল	৫২
রাইস ব্রান তেল	৫৩
ফ্লাওয়ার মিল	৫৪
ডাল মিল	৫৫

পশ্চিমবঙ্গের উদ্যানপালন

পশ্চিমবঙ্গে উদ্যানপালনের ভূমিকা ঃ

বিভিন্ন কৃষি জলবায়ু অঞ্চলের প্রাকৃতিক সুবিধা পাওয়ায় নানাবিধ উদ্যানজাত ফসল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সারা দেশের মোট সব্জী উৎপাদনের ১৪.১৫ শতাংশ যোগান দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সব্জী উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আনারস (মোট উৎপাদনের ১৮.১৯ শতাংশ) উৎপাদনেও এই রাজ্য প্রথম। দেশের মোট কাটা ফুল উৎপাদনের ২৬.৭৪ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদিত হয়।

এই রাজ্যের বিভিন্ন কৃষি জলবায়ু উপোযোগী অঞ্চলে উন্নত মানের চারা, উন্নত/হাইব্রীড বীজের উৎপাদনের সুযোগ থাকায় উচ্চফলনশীল ও উন্নত মানের উদ্যানজাত ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই রজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ল্যাটেরাইটিক ও পলিমাটিযুক্ত বিশাল এলাকা ফল চাষের পক্ষে উপযোগী। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে ফল ও সবজির উৎপাদন ও সংরক্ষণ ক্ষমতা অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উদ্যানপালন অধিকারের লক্ষ্য ঃ

উদ্যানপালন অধিকারে মুখ্য লক্ষ হল প্রযুক্তি-নির্ভর, চাহিদা অনুযায়ী উদ্যানপালনের সুস্থায়ী উন্নয়ন, উদ্যানপালন প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে উদ্যানপালন ক্ষেত্রে সামগ্রিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা ও মুনাফা বৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টির সুরক্ষা প্রদান, গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। এই অধিকারের মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্র পোষিত, কেন্দ্রীয় এবং ফ্ল্যাগশিল্প মিশন সমূহ প্রকল্পগুলি রূপায়িত হয়ে চলেছে।

* উন্নত জাতের সাহায্যে উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদনশীলতা ও গুনমান বৃদ্ধি।
* উদ্যানজাত ফসলের গুনমানসম্পন্ন চারা উৎপাদন।
* প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার এবং কৃষি উপকরনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি।
* উন্নততর কৃষি প্রযুক্তির সাহায্যে ফলের বাগানের পরিচর্য্যা।
* সুসংহত চয়োনত্তর পরিচর্য্যার মাধ্যমে ফসল নষ্টের পরিমান কমানো।
* রাজ্য কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয় উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তির প্রচার ও প্রসার ঘটানো।
* বিভিন্ন উন্নত কৃষি প্রযুক্তি যেমন অনুসেচ, সুরক্ষিত চাষ ইত্যাদির সুপ্রয়োগ।
* কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে সম্মিলিত উৎপাদন এবং ফসল বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদান।
* দক্ষ ও অদক্ষ মানব সম্পদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

উদ্যানপালন অধিকারের কার্য্যবলী ঃ

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় উদ্যানপালন ক্ষেত্রে বাজারের সাথে কৃষকের সরাসরি যোগাযোগ বৃদ্ধি। অধিকতর মুনাফা এবং মধ্যস্তত্ত্বভোগীদের দখলদারী কমানোর উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত মোট তিরিশ (৩০)টি 'কৃষক উৎপাদক সংস্থা' গঠিত ও নিবন্ধীভুক্ত হয়েছে। উদ্যানপালন অধিকারের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের উদ্যানপালনে অংশগ্রহণ মূলক কৃষির সূচনা করা হয়েছে। উদ্যোগপতিদের প্রয়োজন মূলক ও পছন্দ অনুযায়ী ফল, সব্জী ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য 'কৃষক উৎপাদক কোম্পানী' এবং বেসরকারী উদ্যোগপতিদের মধ্যে চুক্তির ব্যবস্থাই হল 'অংশগ্রহণমূলক কৃষি'। পারস্পরিক সম্মতিতে পূর্ব নির্ধারিত দামে সমস্ত উৎপাদিত পণ্য বেসরকারী উদ্যোগপতিগণ কিনতে বাধ্য থাকবেন। বেসরকারী উদ্যোগপতিদের চাহিদা অুযায়ী ফল এবং সব্জী উৎপাদনের জন্য 'কৃষক উৎপাদক সংস্থা' এদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হবে। এর ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে বাজারের ঝুঁকি এড়িয়ে লাভজনক মূল্যে উৎপন্ন ফসলের উৎপাদনশীলতা ও গুণমান বৃদ্ধির সাথে সাথে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সমস্ত সুবিধা প্রদানে সাহায্য করবে।

মৌ বাক্সের মাধ্যমে মৌপালনের সুবিধার্থে ও যথাযত স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মৌপালকদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। সুসংহত কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে এই রাজ্যের কৃষকগণ মৌমাছি পালনের কাজ করেন। কৃষি ও উদ্যানজাত বৃদ্ধি ছাড়াও গ্রামীন এলাকতে আয় ও কর্মসংস্থানে মধু ও এর বিভিন্ন

উপজাত দ্রব্যাদি যথা, রয়্যাল জেলি, চাকভাঙা মধু, প্রোপোলিস্, মোম, মৌবিষ ইত্যাদি উপাদানে মৌ পালন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিজ্ঞান সম্মত মৌমাছি পালনের জন্য উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দেগঙ্গাতে একটি রাজ্য স্তরের মধু কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এই রাজ্য থেকে টাটকা উদ্যানজাত ফসল ইউরোপীয়ান ইউনিউনভুক্ত দেশগুলিতে রপ্তানী করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিধি অনুসারে রপ্তানীযোগ্য উদ্যানজাত ফসল উৎপাদকদের তথ্যাদি নথিভুক্ত করণের কাজ শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে রপ্তানীযোগ্য আম, লিচু, পান, লাউ, ঢেঁড়শ, ফুল, পাতা সব্জী প্রভৃতি উদ্যানজাত ফসল ইউরোপীয়ান ইউনিউনভুক্ত ও মধ্য প্রাচ্য দেশগুলিতে রপ্তানীকরণের উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

পুনাতে অবস্থিত জাতীয় আঙ্গুর গবেষনা কেন্দ্রের প্রযুক্তিগত পরামর্শ ও সহযোগীতায় বাঁকুড়া জেলার তালডাঙরা উদ্যানপালন গবেষণা ও উন্নয়ন খামারে বীজবিহীন বাণিজ্যিক জাতের (থম্পশন্ সীডলেশ, মেডিকা, মঞ্জরি, নবীন, ফ্যান্টাসি সীডলেশ্ ইত্যাদি) আঙ্গুর চাষ করা হচ্ছে। পুনাস্থিত জাতীয় আঙ্গুর গবেষণা কেন্দ্রের মতে প্রক্রিয়াকরণযোগ্য আঙ্গুরের এই জাতগুলি বাঁকুড়া জেলার কৃষি জলবায়ুর সাথে মানানসই।

উত্তরবঙ্গে বাণিজ্যিক প্রজাতির নতুন ধরনের ফল যেমন ড্রাগন ফ্রুট, স্ট্রবেরী ফলের বাণিজ্যিক চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলাতে ড্রাগন ফ্রুট চাষের প্রদর্শনী ক্ষেত্র করা হয়েছে।

<u>পশ্চিমবঙ্গে উদ্যানপালন ক্ষেত্রে নতুন দিশার খতিয়ান ঃ</u>

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন বিভাগের উদ্যোগে উদ্যানপালন ক্ষেত্রে ২০১১-১২ অর্থবর্ষ থেকে এখনও অবধি নিম্নলিখিত সাফল্য অর্জিত হয়েছে;

* মালদহ ও মুর্শিদাবাদের উৎকৃষ্ট আমের জন্য প্রসিদ্ধ। লক্ষনভোগ, হিমসাগর ও ফজলি আমের অসামান্য স্বাদ ও গন্ধের নিশ্চয়তা বজায় রাখতে 'জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন' (জি.আই) তকমা পেয়েছে।
* জৈব চাষকে জনপ্রিয় করার এবং জৈব ক্ষারের যোগান বাড়ানোর লক্ষ্যে কেঁচো সার উৎপাদনে জোর দেওয়া হচ্ছে।
* ২১২টি স্বল্প মূল্যের পিঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরীতে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে।
* ১১টি বহুমুখী হিমঘর তৈরীতে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে।
* ৪টি হিমঘরের সৌরবিদ্যুতায়নে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে।
* ১টি ফল পক্ককরণ কেন্দ্র তৈরীতে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে।
* ১৪টি খামার সন্নিহিত প্যাক্ হাউস তৈরীতে আর্থিক সহযোগিতা করা হয়েছে।
* বারাসাত প্যাক্ হাউস ও মালদা প্যাক্ হাউস এর পুনরুজ্জীবন করা হয়েছে।
* হুগলী জেলার চুঁচুঁড়ায় সব্জীর উৎকর্ষ কেন্দ্র তৈরীর কাজ চলছে।
* সুরক্ষিত চাষের (পলি হাউস/সেড নেট হাউস) ব্যবস্থাপনাতে সারা বছর ধরে উচ্চ মূল্যের ফুল যেমন- জারবেরা, অর্কিড; সব্জী যেমন- ক্যাপসিকাম, টমাটো এবং পান চাষ ক্রমশঃ জনপ্রিয় ও লাভজনক হয়েছে।
* উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, বছরব্যাপী উৎ সাহব্যঞ্জক প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারন, অনুদান প্রদান, এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সফল রূপায়নের ফলে সকল উদ্যানজাত ফসলের এলাকা এবং উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
* কৃষক উৎপাদক সংস্থাদের ৪৯টি যন্ত্রচালিত চার চাকার ফল ও সব্জি বিপনণযান ক্রয় করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
* খাদ্য প্রক্রিয়াকরন শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় পাঁশকুড়া ফুল বাজারের নবীকরণ এবং অসময়ে ফুল সংরক্ষণের জন্য এই বাজারে একটি ২৬ মেট্রিক টনের হিমঘর নির্মান করা হয়েছে।
* সাম্প্রতিক বছরে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গাইঘাটা,হাবরা-২ নং ব্লকে ফুল চাষের উত্তোরোত্তর বৃদ্ধিকে নজরে রেখে ফুলের ব্যবসার পরিকাঠামোগত উন্নয়নে গাইঘাটায় ফুলের আধুনিক বাজার স্থাপনের কাজ চলছে।

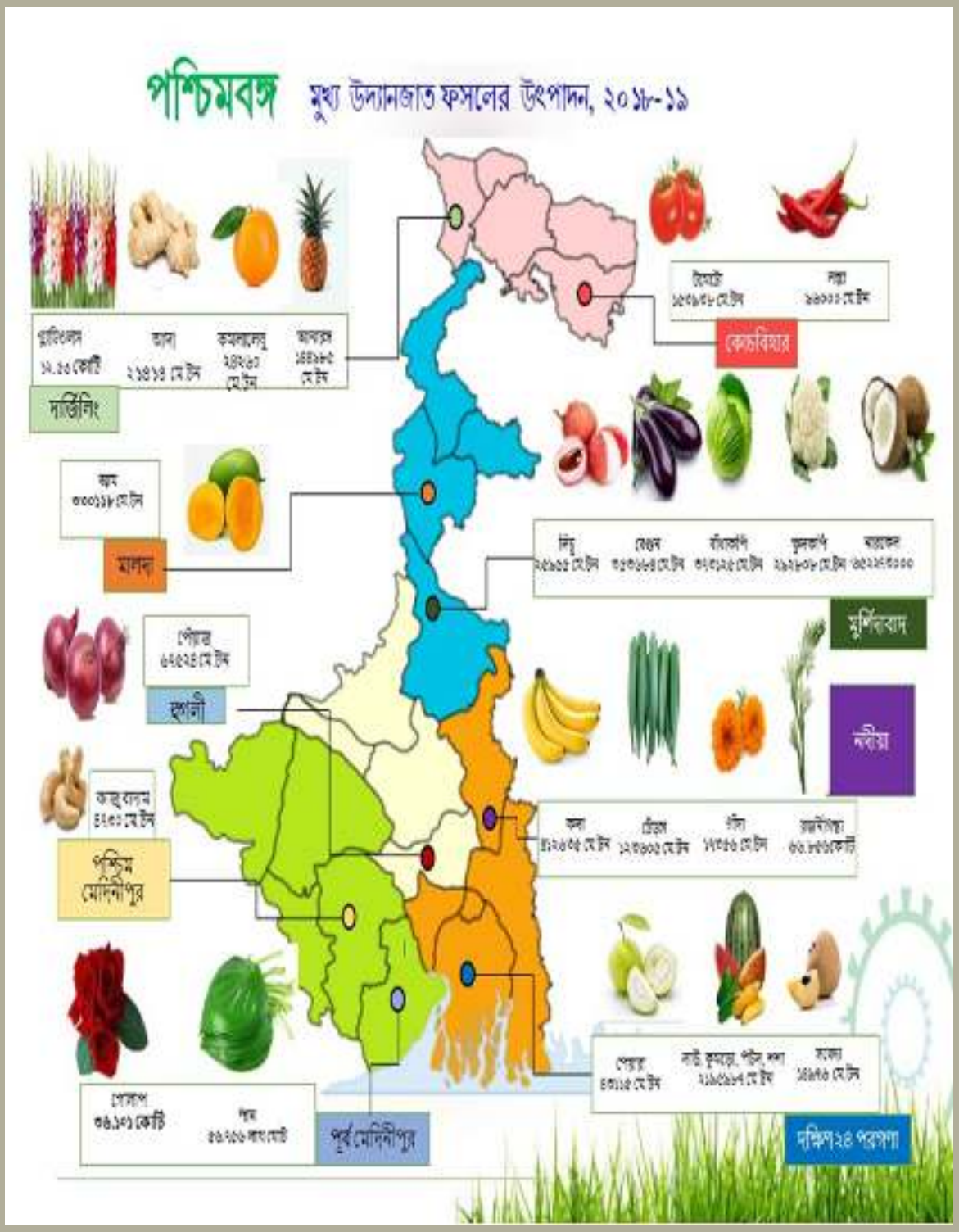

পশ্চিমবঙ্গ
মুখ্য উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন, ২০১৮-১৯
দার্জিলিং
কোচবিহার
মালদা
মুর্শিদাবাদ
হুগলী
নদীয়া
পশ্চিম মেদিনীপুর
পূর্ব মেদিনীপুর
দক্ষিণ২৪ পরগণা

উদ্যানপালন ক্ষেত্রের বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা এবং আধুনিক উদ্যানপালন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাবলি

সুসংহত উদ্যানপালন উন্নয়ন মিশনের উল্লেখযোগ্য প্রকল্প সমুহ

১) সুরক্ষিত চাষ করার জন্য কাঠমো নির্মান ঃ

(প্রকল্প-গুলির পরিকাঠামো (অনুসেচ ব্যবস্থা সমেত) কেন্দ্র/রাজ্য সরকারী অনুমোদিত সংস্থাদ্বারা ও মান অনুযায়ী করতে হবে)

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
ক) ৫০০ বর্গমিটার এলাকায় ধাতব নল সহযোগে স্বাভাবিক বায়ুচলাচল যুক্ত পলি /গ্রীন হাউস গঠন	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (১০৬০/- টাকা প্রতি বর্গমিটার-৫০০ বর্গ.মি. অবধি; ৯৩৫/- টাকা প্রতি বর্গমিটার-৫০০-এর বেশী থেকে ১০০৮ বর্গমি. অবধি; অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে যথাক্রমে, ৫৩০/- টাকা; ৪৬৭.৫০ টাকা অনুদান।	প্রতি বর্গমিটারে বর্গ মিটার অনুযায়ী প্রকল্প - মূল্যের ৫০ শতাংশ হারে এককালীন সহায়তা/অনুদান প্রদান করা হবে। সর্বনিম্ন ৫০০ বর্গমিটার থেকে সর্বোচ্চ ৪০০০ বর্গমি. পর্যন্ত। পরিকাঠামোর মধ্যে অনুসেচের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।
খ) ২০০ বর্গ মিটার এলাকায় বাঁশ সহযোগে স্বাভাবিক বায়ুচলাচল যুক্ত পলি / গ্রীন হাউস গঠন	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (৪৫০/- টাকা প্রতি বর্গমিটার) - ৫০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে ২২৫/- টাকা অনুদান	প্রতি বর্গমিটারে ২২৫ টাকা হারে এককালীন সহয়তা/ অনুদান প্রদান করা হবে। সর্বনিম্ন ২০০ বর্গমিটার থেকে সর্বোচ্চ ৪০০০ বর্গমি. পর্যন্ত। এক একটি ইউনিট ২০০ বর্গমিটারের হতে হবে। পরিকাঠামোর মধ্যে অনুসেচের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।
গ) ধাতব নল সহযোগে ছায়া জাল নির্মিত ঘর গঠন।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (৭১০/- টাকা প্রতি বর্গমিটার) - ৫০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে ৩৫৫/- টাকা অনুদান	প্রতি বর্গমিটারে ৩৫৫ টাকা হারে এককালীন সহয়তা/ অনুদান প্রদান করা হবে। সর্বনিম্ন ৫০০ বর্গমিটার থেকে সর্বোচ্চ ৪০০০ বর্গমি. পর্যন্ত। পরিকাঠামোর মধ্যে অনুসেচের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।
ঘ) ২০০ বর্গ মিটার এলাকায় বাঁশ সহযোগে স্বাভাবিক বায়ুচলাচল যুক্ত ছায়া জাল নির্মিত ঘর গঠন।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (৩৬০/- টাকা প্রতি বর্গমিটার) - ৫০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে ১৮০/- টাকা অনুদান	প্রতি বর্গমিটারে ১৮০ টাকা হারে এককালীন সহয়তা/ অনুদান প্রদান করা হবে। সর্বনিম্ন ২০০ বর্গমিটার থেকে সর্বোচ্চ ৪০০০ বর্গমি. পর্যন্ত। এক একটি ইউনিট ২০০ বর্গমিটারের হতে হবে।পরিকাঠামোর মধ্যে অনুসেচের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

২) সুরক্ষিত কাঠামোয় সবজী / ফুল চাষ ঃ

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
ক) পলি / গ্রীন হাউসে উচ্চ মূল্য যুক্ত সবজী চাষে সহায়তা প্রদান।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (১৪০/- টাকা প্রতি বর্গমিটার) ৫০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে ৭০/- টাকা অনুদান	প্রতি বর্গমিটারে ৭০ টাকা হারে এককালীন সহায়তা/ অনুদান প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ ৪০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত সহায়তা / অনুদান।
খ) পলি / গ্রীন হাউসে এবং ছায়া জাল নির্মিত ঘরে জারবেরা বা কারনেশন চাষে সহায়তা প্রদান।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (৬১০/- টাকা প্রতি বর্গমিটার) ৫০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে ৩০৫/- টাকা অনুদান	প্রতি বর্গমিটারে ৩০৫ টাকা হারে এককালীন সহায়তা/ অনুদান প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ ৪০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত সহায়তা / অনুদান।
গ) পলি / গ্রীন হাউসে এবং ছায়া জাল নির্মিত ঘরে গোলাপ চাষে সহায়তা প্রদান।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (৪২৬/- টাকা প্রতি বর্গমিটার) ৫০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে ২১৩/- টাকা অনুদান	প্রতি বর্গমিটারে ২১৩ টাকা হারে এককালীন সহায়তা/ অনুদান প্রদান করা হবে। সর্বোচ্চ ৪০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত সহায়তা / অনুদান।
ঘ) উদ্যানজাত ফসলে পাখি এবং শীলাবৃষ্টি নিরোধক জালিকার ব্যবহার।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (৩৫/- টাকা প্রতি বর্গমিটার) ৫০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি বর্গমিটারে ১৭.৫০/- টাকা অনুদান	প্রতি বর্গমিটারে ১৭.৫০ টাকা হারে এককালীন সহায়তা/ অনুদান প্রদান করা হবে। সর্বনিম্ন ৫০০ বর্গমিটার থেকে সর্বোচ্চ ৫০০০ বর্গমিটার পর্যন্ত ।
ঙ) উদ্যানজাত ফসল চাষে মাটিতে পলিথিন আচ্ছাদনের ব্যবহার।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (৩২০০০/- টাকা প্রতি হেক্টরে) ৫০ শতাংশ হারে অর্থাৎ প্রতি হেক্টর ১৬,০০০/- টাকা অনুদান	প্রতি হেক্টর১৬,০০০ টাকা হারে এককালীন সহায়তা/ অনুদান প্রদান করা হবে। একজন কৃষক কমপক্ষে ০.০৫ হেক্টর (৭.৫ কাঠা) থেকে সর্বোচ্চ ২ (দুই) হেক্টর পর্যন্ত প্রকল্পটি রূপায়ন করতে পারবেন।

৩) ২৫ টন রক্ষন ক্ষমতা যুক্ত স্বল্প মূল্যের পেঁয়াজ সংরক্ষন কেন্দ্র স্থাপন ঃ

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
২৫ টন রক্ষন ক্ষমতা যুক্ত স্বল্প মূল্যের পেঁয়াজ সংরক্ষন কেন্দ্র স্থাপন।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (১,৭৫,০০০/- টাকা / প্রতিটি) ৫০ শতাংশ হারে এককালীন অনুদান অর্থাৎ প্রতি ইউনিটের জন্য ৮৭,৫০০ টাকা অনুদান।	কেবলমাত্র একজন কৃষক একটি সংরক্ষন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

৪) পুরানো ফল বাগানের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন ঃ

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
পুরানো ফল বাগানের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন (৩০ বছর বা তার বেশি বয়েসের গাছ)।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (৪০,০০ টাকা / হেক্টর) ৫০ শতাংশ হারে অনুদান অর্থাৎ প্রতি হেক্টর ২০,০০০ টাকা এককালীন অনুদান দেওয়া হবে।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ২ (দুই) হেক্টর পর্যন্ত পুরানো স্থায়ী আম বাগানের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবন করতে পারবেন। সার প্রয়োগ ও অপ্রয়োজনীয় ডাল পালা ছাটাই এর মাধ্যমে প্রকল্পটি রূপায়ন করতে পারবেন।

৫) নতুন ফল বাগান তৈরী ও ফল চাষের এলাকা সম্প্রসারন ঃ

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
ক) স্বল্পবর্ষজীবী ফল চাষের এলাকা বৃদ্ধি (কেবলমাত্র টিসুকালচার কলা)।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (১,০২,৪৬২ টাকা / হেক্টর) ৪০ শতাংশ হারে অনুদান অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ৪০,৯৮৪.৮০ টাকা দুই বছর ধরে (৭৫ ঃ ২৫) দুই দফায় দেওয়া হবে। ঐ টাকার চারা সরবরাহ করা হবে।	প্রথম বছরের অনুদানের অর্থে টিসু কালচার কলার চারা সরবরাহ করা হবে। একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৪ (চার) হেক্টর পর্যন্ত টিসুকালচার কলা বাগান তৈরী করতে পারবেন।
গ) নতুন আম / পেয়ারা চাষের এলাকা বৃদ্ধি	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (৩৮,৩৪০ টাকা / হেক্টর) ৫০ শতাংশ হারে অনুদান অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ১৯.১৭০ টাকা তিন বছর ধরে (৬০ ঃ ২০ ঃ ২০) তিন দফায় দেওয়া হবে।	একজন কৃষক সর্বোচ্চ ৪ হেক্টর এলাকা চাষ করতে পারেন।

৬) হাইব্রীড সবজী চাষের এলাকা সম্প্রসারন ঃ

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
ডাইব্রীড সবজী চাষ	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের (৫০,০০০টাকা / হেক্টর) ৪০ শতাংশ হারে এককালীন অনুদান অর্থাৎ প্রতি হেক্টরে ২০,০০০ টাকা অনুদান	একজন ক্ষুদ্র বা প্রান্তিক কৃষক সর্বোচ্চ ২ হেক্টর পর্যন্ত সবজী চাষ করতে পারবেন।

৭) মৌমাছি পালনের মাধ্যমে পরাগযোগে সহায়তা ঃ

প্রকল্প	অনুদান	মন্তব্য
মৌমাছি সহ ৮টি ফ্রেম এবং একটি মৌ পালনের বাক্স ক্রয়ে সহায়তা প্রদান	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের ৪,০০০টাকা প্রতি ইউনিট ৪০ শতাংশ হারে ।	প্রস্তাবিত প্রকল্প মূল্যের ৪,০০০টাকা প্রতি ইউনিট ৪০ শতাংশ হারে অর্থাৎ এককালীন প্রতি ইউনিটের ১,৬০০ টাকা অনুদান প্রদান করতে পারেন।

সুসংহত উদ্যানপালন উন্নয়ন মিশন / রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা প্রকল্প রূপায়ণের নিয়মাবলী

১। সুংসংহত উদ্যানপালন উন্নয়ন মিশন / রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার সকল প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার বাসিন্দা হওয়া এবং এই জেলায় নিজস্ব জমি থাকা প্রয়োজন। প্রমান হিসাবে ভোটার এবং আধার কার্ডের প্রতিলিপি এবং চাষের অধিকার বিষয়ক কাগজ পত্র আবেদনকারীর স্বাক্ষরসহ আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

২। সুংসংহত উদ্যানপালন উন্নয়ন মিশনের সকল ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশ তপশিলী জাতী, ৮ শতাংশ তপশিলী উপ-জাতী এবং ৩০ শতাংশ মহিলা আবেদনকারীর জন্য সংরক্ষিত। ক্ষুদ্র, প্রান্তি এবং সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ভুক্ত কৃষকগণ ছাড়াও স্বনির্ভর গোষ্ঠী / সমবায় সংস্থাকে অনুদান প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৩। আবেদনকারীর ক্ষেত্র বা বাগান এবং ফসলের বা প্রকল্পের অবস্থা পরিদর্শণ / পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করার পরে জেলার বরাদ্দ অনুযায়ী সহায়তা প্রদান করার ব্যাপারে বিবেচনা করা হয়।

৪। আর্থিক সহায়তার অর্থ N.E.F.T এর মাধ্যমে উপস্বত্বভোগীকে প্রদান করা হবে। অনুদান গ্রহীতার সেভিংস ব্যাঙ্কের সক্রিয় অ্যাকাউন্ট থাকা আবশ্যক।

৫। প্রত্যেক আবেদনকারীকে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত আবেদন পত্রে আবেদন করতে হবে (মোবাইল নং আবশ্যিক)। জাতীয় উদ্যানপালন মিশন / রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার নির্ধারিত আবেদন পত্রের অবিকল প্রতিলিপি (ফটোকপি / জেরক্স) ব্যবহার করা যাবে। আবেদন পত্র জেলা / মহাকুমা উদ্যানপালন / পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে পাওয়া যাবে।

৬। প্রকল্পগুলি রূপায়ণের পর আবেদন পত্রটি পঞ্চায়েত সমিতিতে জমা দিতে হবে। এরপর পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক মহাশয় সেগুলি জেলা উদ্যানপালন কার্যালয়ে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করবেন। বরাদ্দ অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি থেকে প্রাপ্ত নির্বাচিত তালিকা জেলাতে অনুমোদনের পর আর্থিক সহায়তা সরাসরি উপসত্বভোগীর ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টে প্রদান কর হবে; পঞ্চায়েত সমিতিতে উদ্যানপালন দপ্তরের প্রতিনিধি (ফিল্ড কনসালটেন্ট) না থাকলে জেলার মাধ্যমে ক্ষেত্র বিশেষে কিছু প্রকল্প রূপায়ণ করা হতে পারে।

৭। আবেদনকারীর নিজস্ব জমির মোট পরিমাণ এবং রূপায়িত প্রকল্পে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ পৃথকভাবে আবেদন পত্রতে দেওয়া নির্দিষ্ট স্থানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

৮। হাইব্রীড লঙ্কা চাষ -হাইব্রীড সবজি চাষ / নতুন পেয়ারা বাগানে সহায়তা প্রদান / বীজ বা কন্দ জাতীয় মশলা চাষে সহায়তা প্রদান / বহুবর্ষজীবি মশলা (গোলমরিচ ইত্যাদি) চাষে সহায়তা প্রদান / খারিফ পেঁয়াজ চাষ ইত্যাদি প্রকল্পের ক্ষেত্রে জমির ন্যূনতম পরিমাণ ৭.৫ কাঠা (১২.৫ শতক) হতে হবে।

৯। জাতীয় উদ্যানপালন মিশন / রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অন্তর্গত এই ফর্মে উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রকল্প রূপায়ণ করার পর যাতবতীয় কাগজ পত্র (মূল ক্যাশমেমো, ভোটার এবং আধার কার্ডের প্রতিলিপি, নির্দিষ্ট জমির পর্চা ও জমিতে চাষের অধিকার সংক্রান্ত প্রমানাদি, ব্যাঙ্কের পাশবই এর প্রথম পাতা এবং সর্বশেষ আপডেট করা পাতার প্রতিলিপি, অন্যান্য মূল রশিদ ইত্যাদি এবং শুধুমাত্র হাইব্রীড সবজির / লঙ্কার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বীজের খালি প্যাকেট) নির্ধারিত আবেদন পত্রে সাথে আবেদনকারীর স্বাক্ষর সহ একত্রে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

১০। অনুদানপ্রাপ্ত এলাকার জমিতে / বাগানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ, জাতীয় উদ্যানপালন মিশন, এর আর্থিক অনুদানপ্রাপ্ত, প্রকল্পের নাম ও প্রাপকের নাম সহ ৩ ফুট X ২ ফুট মাপের একটি বোর্ড মিশনের প্রতীক সহ লাগাতে হবে। অনুদানপ্রাপ্ত এলাকার জমিতে বোর্ড সহ আবেদনকারীর নিজের ছবি আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

১১। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রকল্প রূপায়ণ করতে হবে। নতুবা সফল রূপায়ণকারী পঞ্চায়েত সমিতি / আবেদনকারীকে

অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। আবেদন পত্র আগে জমা দিলে অনুদান প্রদানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে (আর্থিক বরাদ্দ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত)। সকল প্রকল্প ও নিয়মাবলী সময় বিশেষে এবং পরিস্থিতি অনুসারে পরিবর্তনযোগ্য। প্রকল্পের সহায়তার সকল বিষয়ে জেলা উদ্যান পালন কমিটি, উত্তর ২৪ পরগণা-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১২। কোনো আবেদনকারী একই জমিতে একই ধরনের প্রকল্পের জন্য অন্যত্র বা ভিন্ন সংস্থা থেকে অনুদান গ্রহণ করে থাকলে আবার জাতীয় উদ্যানপালন মিশন / রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অন্তর্গত সেই প্রকার প্রকল্পের সহায়তার জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

১৩। সহায়তা বা অনুদান প্রদান করার পরেও যদি দেখা যায় কোনো কৃষক ইচ্ছাকৃত ভাবে অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে সহায়তা গ্রহণ করেছেন বা এই প্রকল্পটি নষ্ট করেছেন তবে ঐ কৃষক সম্পূর্ণ অনুদানের অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন বা তাঁর বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আবেদন পত্রের সাথে যে সকল নথিপত্র / তথ্য দিতে হবে সেগুলি নিম্নরূপ

১। বাসস্থানের প্রমানপত্র এবং আবাদী জমির মালিকানা বা চাষের অধিকার বিষয়ক কাগজ পত্রের অবিকল অনুলিপি আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করে দিতে হবে।

২। আবাদী জমির মালিকানার প্রমাণপত্র (ক) যেমন নিজের জমির পর্চা, খতিয়ানের অনুলিপি আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করে দিতে হবে। (খ) বাবা বা মায়ের নামে জমিতে প্রকল্প করতে হলে ১০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে জমির বিবরণ এবং লীজের মেয়াদ উল্লেখ করে 'আপত্তি নেই' (নো-অবজেকশন) শংসাপত্র দাতা ও গ্রহীতার স্বাক্ষর সহ দিতে হবে। বাবা অথবা মা জীবিত না থাকলে পঞ্চায়েত থেকে ওয়ারিশন সার্টিফিকেট দিতে হবে। এক্ষেত্রে একাধিক ওয়ারিশন থাকলে বাকিদের ১০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে জমির বিবরণ এবং লীজের মেয়াদ উল্লেখ করে নে-অবজেকশন শংসাপত্র দাতা ও গ্রহীতার স্বাক্ষরসহ দিতে হবে।

৩। ইজারা বা লীজ প্রাপ্ত জমিতে প্রকল্প রূপায়ন করা হলে লীজদাতার জমির পর্চা, খতিয়ানের প্রতিলিপি স্বাক্ষর করে দিতে হবে এবং ১০ টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে লীজের সময়সীমা, লীজনামা, দাতা ও গ্রহীতার স্বাক্ষর সহ দাখিল করতে হবে এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান / জন প্রতিনিধির শীল সহ স্বাক্ষর এবং 'বিষয় টি সত্য' শংসাপত্র দিতে

৪। ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপ-জাতি ইত্যাদি সংক্রান্ত শংসাপত্র অবিকল অনুলিপি স্বাক্ষর করে জমা দিতে হবে।

৫। বিবিধ দফাওয়ারী খরচের আসল ক্যাশমেমো (বীজ, চারা রাসায়নিক সার, রাসায়নিক ও জৈবিক কীট / ছত্রাক নাশক প্রভৃতির জন্য) ইত্যাদির কাগজ পত্র আবেদনকারীকে স্বাক্ষর করে জমা দিতে হবে।

৬। কাঁচা রশিদের (জৈব সার / মজুরি ইত্যাদির) ক্ষেত্রে লম্বা বড় কাগজে বিস্তারিত লিখে বিক্রেতা, ক্রেতা একজন স্বাক্ষীর সহ জমা দিতে হবে।

৭। প্রকল্প স্থান পরিদর্শন ও যাচাইয়ের সুবিধার্থে আবেদনকারীর বাড়ী ও প্রকল্পস্থানে পৌঁছানোর জন্য পথ নির্দেশিকা (মোবাইল নং সহ / নিজের না থাকলে নিকটবর্তী পরিচিত করোর হলেও চলবে) আবেদন পত্রের যথাযথ স্থানে লিখে (প্রয়োজন হলে কাগজে আলাদা করে লিখে) আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

ফল ও সব্জীর সুসংহত সংরক্ষণ ব্যবস্থাসমূহ - সহায়তা প্রকল্প			
ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের খরচ	ভর্তুকি
১	ফল ও সব্জীর খামারে মোড়ক-ঘর (প্যাক্ হাউস)	সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ৪,০০,০০০ টাকা / প্রকল্প ৯মিঃ x ৬ মিঃ আয়তন	প্রকল্প ব্যয়ের ৫০ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
২	সুসংহত ফল ও সব্জীর মোড়ক ঘর (প্যাক্ হাউস) কন্‌ভেয়ার বেল্ট, বাছাই, ধোয়া-শুকানো ও ওজনের ব্যবস্থা সহ	সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ৫০,০০,০০০ টাকা / প্রকল্প ৯ মিঃ x ১৮ মিঃ আয়তন	প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
৩	ফল ও সব্জীর প্রাক্-শীতলীকরণ কক্ষ	সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ২৫,০০,০০০ টাকা / প্রকল্প ৬ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন	প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
৪	শীতলীকরণ কক্ষ (মধ্যস্থতা ব্যবস্থা)	সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ১৫,০০,০০০ টাকা / প্রকল্প ৩০মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন	প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
৫	ফল ও সব্জীর ভ্রাম্যমান প্রাক্ শীতলীকরণ যান	সর্বোচ্চ ক্রয় মূল্য ২৫,০০,০০০ টাকা	ক্রয় মূল্যের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
৬	হিমঘর (নির্মান, সম্প্রসারণ এবং আধুনিকীকরণ		
	ক) একটি কক্ষ বিশিষ্ঠ, একক তাপমাত্রা বিশিষ্ট হিমঘর টাইপ-১	সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ৮,০০০ টাকা / প্রতি মেঃটন (সর্বোচ্চ ৫,০০০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন)	প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
	খ) ফল ও সব্জীর সংরক্ষণের ছয়টি বা তদূর্দ্ধ কক্ষ বিশিষ্ঠ, বহু তাপমাত্রা বিশিষ্ট বহুমুখী হিমঘর টাইপ-২	সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ১০,০০০ টাকা / প্রতি মেঃটন (সর্বোচ্চ ৫,০০০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন)	প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
	গ) ফল ও সব্জীর সংরক্ষণের উপযোগী টাইপ-২ বহুমুখী হিমঘর ও নিয়ন্ত্রত পরিবেশ হিমঘরের সংযোজিত প্রযুক্তি সহ	অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা / প্রতি মেঃটন নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ হিমঘরের সংযোজিত প্রযুক্তির জন্য	প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
৭	প্রযুক্তির আবেশ এবং হিমজ শৃঙ্খলের আধুনিকীকরণ	সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা / প্রতি মেঃ টন (সর্বোচ্চ ৫,০০০ মেঃ টন ক্ষমতা জন্য)	প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
৮	ফল ও সব্জীর শীতলকৃত পরিবহনযান	সর্বোচ্চ ক্রয় মূল্য ২৬,০০,০০০ টাকা	ক্রয় মূল্যের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
৯	প্রাথমিক / ভ্রাম্যমান প্রক্রিয়াকরণ	২৫,০০,০০০ টাকা / প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়ের ৪০ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
১০	ফল পক্ককরণ-কক্ষ (রাইপেনিং চেম্বার)	সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০ টাকা / প্রতি মেঃ টন সর্বোচ্চ ৩০০ মেঃ টন ক্ষমতা সম্পন্ন	প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
১১	সুসংহত হিমজ-শৃঙ্খল (কোল্ড চেন্)	সর্বোচ্চ প্রকল্প ব্যয় ৬,০০,০০,০০০ টাকা	প্রকল্প ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ পর্য্যন্ত আর্থিক সহায়তা
উপরোক্ত ক্রঃ নংঃ ২-১১-র আর্থিক সহায়তাগুলি ব্যাঙ্ক অথবা আর্থিক সংস্থা থেকে নেওয়া ঋণের পশ্চাৎ-সংযোগী (ব্যাক্-এন্ডেড্)।			

টিস্যুকালচার কলার চাষ

কলা বিভিন্ন খাদ্যগুণে ভরপুর একটি অন্যতম প্রধান ফল। নিত্যব্যবহার্য্য এই ফল অত্যন্ত সহজলভ্য হওয়ায় আমাদের রাজ্যে এর চাহিদা ও চাষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কলার চাষ পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত লাভজনক। টিস্যুকালচার কলা জলদি ফলন দেয়, একসাথে ফল কাটা যায় ও বেশি ফলন পাওয়া যায়।

নির্বাচন ঃ

খুব এঁটেল এবং খুব বেলেমাটি ছাড়া প্রায় সবরকম মাটিতে কলা চাষ করা যায়। সেচের সুবিধা যুক্ত উঁচু জায়গায় যেখানে জল জমে না, এমন জমি এই কলা চাষের জন্য উপযুক্ত।

জাত ঃ

গ্রান্ড নাইন (জি-৯),

চারা নির্বাচন ঃ

সমান মাপের ও বয়সের চারা নির্বাচন প্রয়োজন। সাধারণত ৪-৬ সপ্তাহ বয়সের ৯" - ১২" উচ্চতার ৪-৫টি পাতাযুক্ত সবল ও নিরোগ চারা বাছাই করে লাগাতে হবে। চারার গোড়া ২-২.৫ সেমি হওয়া প্রয়োজন। খুব ছোট চারা সরাসরি মাঠে লাগালে চারা মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ছোট পলিথিন প্যাকেটে টিস্যুকালচার চারা পাওয়া যায়। ওই চারা কয়েকদিন ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে পরিবেশ সইয়ে নিয়ে জমিতে লাগালে চারা মারা যাওয়ার সংখ্যা কমে।

চারা লাগানোর সময় ঃ

পশ্চিমবঙ্গে টিস্যুকালচার কলার চারা শীতকাল ছাড়া সারা বছর লাগানোই যায়। চারা সারাসরি নার্সারি থেকে নিয়ে মাঠে না লাগানো ভালো। কয়েকদিন ছায়াযুক্ত জায়গায় নতুন আবহাওয়ায় সইয়ে নিয়ে জমিতে লাগালে ভালো ফল পাওয়া যায়। খুব গরম, বর্ষা বা ঠান্ডায় টিস্যুকালচার চারা লাগানো উচিত নয়। লাগানোর সময় পলিথিন প্যাকেট সোজাভাবে নির্দিষ্ট গর্তে লাগাতে হবে। চারার যে অংশটি মাটির তলায় আছে, সেই অংশটি গর্তে বসিয়ে কম্পোষ্ট ও মাটি দিয়ে গর্ত ভর্তি করে হালকা জলসেচ দেওয়া দরকার।

দূরত্ব ঃ

১.৮ মিঃ (৬') X ১.৮ মি (৬')। বিঘাতে প্রায় ৪০০ চারা লাগাবে।

গর্তের মাপ ঃ ৫০ সেমি. X ৫০ সেমি X ৫০ সেমি

সার প্রয়োগ ঃ (প্রতি গাছ প্রতি বছর)

কম্পোষ্ট	নাঃ গ্রাঃ	ফসঃ (গ্রাঃ)	পঃ (গ্রাঃ)	
১০	৩০	২৫	১০০	চারা লাগানোর সময়
০	১১০	১৫	১০০	৩ মাস বয়সে
০	৬০	১৫	৫০	৫ মাস বয়সে
০	৩০	০	৫০	৬ মাস বয়সে

ওইরূপ নির্দিষ্ট হারে চার ভাগে ভাগ করে চারা রোপণের সময়, ৩ মাস, ৫ মাস ও ৬ মাস বয়সে গাছের চারিদিকে মাটিতে মিশিয়ে গোড়া বেঁধে দিতে হবে। অনুখাদ্যের অভাবে জিঙ্ক, বোরন, ম্যাঙানিজ প্রয়োগ করা যেতে পারে। অনুখাদ্য পরীক্ষা করে প্রয়োগই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর হালকা জলসেচ অবশ্যই দিতে হবে।

পরিচর্যা ঃ

হালকা করে মাটি কুপিয়ে গাছের গোড়া আগাছামুক্ত রাখা দরকার। এতে সেচের ও জল নিকাশ সুবিধা হয়। নিয়মিত তেউড়, পুরোনো ও রোগগ্রস্ত পাতাগুলি কেটে মাঠের বাইরে গর্তে ফেলে পচাতে হবে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাঁদি বড় হলে বাঁশের ঠেকা দেওয়া প্রয়োজন।

জলসেচ ঃ

প্রতিবার সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে। টিস্যুকালচার গাছ সেচের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর। তাই 'লক্ষ্য' রাখতে হবে গাছ যেন কখনোই শুকিয়ে না যায়। বর্ষাকাল ছাড়া শীতের ও গরমের সময় জমির রসের অবস্থা বুঝে ১০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া প্রয়োজন। সেচের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়- প্রথম বাড়বৃদ্ধি (লাগানোর ৩ মাস) ও কলা যখন মোটা হচ্ছে ।

সাথী ফসল ঃ

চারা লাগানোর ৩ মাসের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি সবজি যেমন-বরবটি, ডাঁটা, পুঁই, মুলা, পালং ইত্যাদি সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা যেতে পারে। এতে জমির পরিচর্যা ভালো হয় এবং জমি আগাছামুক্ত থাকে। কিছুটা বাড়তি আয় হয়। এক্ষেত্রে সাথী ফসলের জন্য নির্দিষ্ট সার অবশ্যই দিতে হবে।

পোকা ঃ

কলার কাঁদি আসতে শুরু করলে ক্ষুদ্র ছিদ্র যুক্ত পাতলা পলিথিন দিয়ে কাঁদি মুড়ে দিতে হয়।

কান্ড ছিদ্রকারী পোকা

লক্ষণ ঃ

এই পোকা গাছের কান্ডের গায়ে বা গোড়ার ক্রন্দের মধ্যে নালি করে। আক্রান্ত ক্রন্দ পচে যায়। গাছ সহজে ভেঙে যায়। পাতা হলদে হয়ে মাঝ থেকে শুকিয়ে যায়। গাছের গোড়া কালো হয়ে পচে যায়।

প্রতিকার ঃ

১। আক্রান্ত গাছের কান্ডটিকে টুকরো টুকরো করে কেটে নষ্ট করে ফেলতে হবে।

২। বাগান পরিষ্কার ও আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৩। গাছের গোড়া ক্লোরপাইরিফস ৪ মি.লি./লিটার জলে গুলে ভিজিয়ে দিতে হবে।

৪। থাইমেট ১০ কেজি - ১০০-১৫০ গ্রাম মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।

দেদো পোকা ঃ

লক্ষণ ঃ এই পোকা কচিপাতা ও কলার খোসা আঁচড়ে খায়। ফলে কলার ও পাতার গায়ে অসংখ্য দাগ দেখা যায়, কলার খোসার উপর ফুটকি ও কালো দাগ সৃষ্টি করে।

প্রতিকার ঃ বর্ষার শুরুতে পোকার আক্রমণে ক্লোরপাইরিফস (৪মি.লি.) বা কার্বারিল (২ গ্রাম) প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

পানামা রোগ ঃ গাছের নিচের দিকের পাতা হলুদ হয়, পরে পাতার বোঁটা পচে ঝুলে পড়ে। কান্ডের নীচের দিক চিরে ফেটে যায়।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত গাছ তুলে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কপার অক্সি ক্লোরাইড ৪ গ্রাম প্রতিলিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

সিগাটোকা রোগ ঃ আক্রান্ত গাছের গোড়ার দিকের ফিকে হলুদ দাগ ধরে, পাতায় দাগ ক্রমশ বড় ও মাকুর মতো হয়ে মাঝখানে শুকিয়ে চোখের মতো দেখায়। সারা বাগান ঝলসে যাওয়ার মতো দেখায়।

প্রতিকার ঃ বাগানের গাছ পাতলা করতে হবে। মরা গাছ ও আগাছা পরিস্কার করতে হবে। কার্বেন্ডাজিম ও ম্যানকোজেরের মিশ্রন ১.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রের করতে হবে।

গোড়া পচা রোগ ঃ প্রথমে মাটির কাছাকাছি উপরে রোগ শুরু হয়। পরে কান্ডের উপরে পচন ধরে। আক্রান্ত স্থানে বাদামি দাগ ধরে। আক্রান্ত কান্ড পচে যায় ও দুর্গন্ধ বের হয়। গাছ ঢলে পড়ে।

প্রতিকার ঃ জলনিকাশী ব্যবস্থা ভালো করতে হবে। বর্ষায় চারা কাটা যাবে না।

ড্রাগন (ফ্রুট) ফলের চাষ

পশ্চিমবঙ্গে নূতন চাষ যোগ্য ফলের মধ্যে ড্রাগন ফ্রুট বা ড্রাগন ফল বাজারে বেশ জনপ্রিয় হচ্ছে। আদতে এই ফল বহুবছর ধরে ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স অঞ্চলের ক্যাকটাস বা সাকুলেন্ট গোত্রের গাছ হিসাবে চাষ হত। উপযুক্ত খঁটিতে (সিমেন্টেড), বেঁধে বিন্যাস করে ডালগুলি বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ২০-৪০ বছর মত থাকে। এই ক্যাকটাসের ডালের প্রান্তে গোল গোল ও গাঢ় লালচে-বেগুনী রঙের আকর্ষনীয় ফল হয়, বাইরে কিছু ভাঁজের মত থাকে। ফলটির ছাল বাদে শাঁসই খাওয়া হয়। এটি ডায়েটারি ফাইবার, ভিটামিন সি, নানা খনিজ লবন, অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, কম ক্যালরি যুক্ত। ক্যানসার সারাতে সক্ষম, ডায়েবেটিক রোগীদের জন্য এটি অতি উত্তম স্বাস্থ্যকর ফল। শাঁসের মধ্যে সুন্দর ভাবে বিন্যাস্ত ছোট ছোট কালো বীজও পৃথক না করে খাওয়া যায়। মে মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। গাছ প্রতি ২০-২৫টা ফল পাওয়া যায়।

তিন ধরনের ফল হয় ঃ
লাল শাঁস- লাল ফল *(Hylocereus polyrizhus)*
সাদা শাঁস- লাল ফল *(Hylocereus undatus)*
সাদা শাঁস- হলুদ ফল *(Hylocereus megalanthus)*

উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়াতে খুব অম্ল বা ক্ষার মাটি ছাড়া সব মাটিতেই এই ফলটি চাষ করা যায়, তবে জল নিকাশীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। লাল শাঁস যুক্ত ড্রাগন ফ্রুটের অত্যধিক চাহিদা এবং ভাল দাম (২০০-৩০০ টাকা কেজি) হিসাবে চাষ করা লাভ জনক।

চারা তৈরী ঃ বীজ থেকে চারা করা যায়। কিন্তু বীজের চারায় মাতৃ গাছের সব গুণ থাকে না। সেজন্য কাটিং থেকে চারা করা ভাল। কাটিং এর চারায় দেড় বছরের মধ্যে ফল ধরে, আর বীজের চারায় ফল ধরতে অনেক দেরি হয়।

ভাল ফলন হয় এমন সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত গাছ থেকে ডাল সংগ্রহ করতে হবে। ডাল কাটার পর কার্বেনডাজিম বা ম্যানকোজেব প্রতি লিটার ২-৩ গ্রাম মিশিয়ে ডালের কাটা অংশ ২-৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে ছায়ায় ১০-১৫ মিনিট শুকিয়ে নিতে হবে।

চারা তৈরীর পলিব্যাগ ঃ ৬-৮ ইঞ্চি মাপের পলিব্যাগে চারা করা যাবে। ১ঃ১ অনুপাতে বেলে-দো-আঁশ মাটি ও জৈব সার মিশিয়ে পলিব্যাগ ১ ইঞ্চি খালি রেখে মিশ্রন ভরতে হবে। এরপর প্রস্তুত প্রকৃত কাটিং পলিব্যাগের মাটিতে ১.৫-২ ইঞ্চি গভীরে পুঁতে দিয়ে ভাল ভাবে মাটি চাপা দিতে হবে।

আর বেডে চারা করার জন্য বেলে-দো-আঁশ যুক্ত মাটি ও জল জমে না এমন উঁচু জমিতে ১ মিটার চওড়া ও সুবিধা মত লম্বা বেড তৈরী করতে হবে। বীজ তলায় পরিমান মত জৈব সার দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর ছয় থেকে ১২ মাসের রোগমুক্ত শক্ত শাখা ৬ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট লম্বা কেটে বেডে বসাতে হবে। অবশ্য বীজতলা ছায়াযুক্ত স্থানে করতে হবে। মাটির রসের অবস্থা অনুযায়ী জল দিতে হবে। এভাবে পরিচর্যা করলে ২৫-৩০ দিনের মধ্যে শিকড় এসে যাবে। প্রায় সারা বছর ধরে চারা করা গেলেও নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস উপযুক্ত সময়।

জমি তৈরী ঃ উপযুক্ত ভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমির মাটি সমান ও আবর্জনা বেছে জমি পরিস্কার করতে হবে। চারা রোপনের ২৫ থেকে ৩০ দিন আগে ৩ মিটারর অন্তর গর্ত করতে হবে। প্রতিটি গর্ত লম্বা, চওড়া ও গভীর হবে ৭৫ সেমি, ৭৫ সেমি, ৭৫ সেমি।

এরপর প্রতি গর্তে ২৫ কেজি জৈব সার, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ৩০০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ এবং ১০ গ্রাম হারে জিপসাম, জিঙ্ক সালফেট ও বোরাক্স মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করে রাখতে হবে।

চারা রোয়ার সময় ঃ সারা বছর ধরে চারা লাগানো যেতে পারে। অবশ্য এপ্রিল-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তম সময়। প্রতি গর্তে ৩-৪টি চারা রোপন করে সিমেন্টের খুঁটিতে লগিয়ে দিতে হবে।

গাছ ছাঁটাই ঃ ড্রাগন ফলের গাছ দ্রুত বাড়ে, এক বছরের গাছে ৩০টি এবং চার বছরের গাছে ১৩০টি পর্যন্ত শাখা তৈরী হতে পারে। এরা লাগানোর এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে গাছে ফল ধরতে শুরু করে। ফল তোলার পর প্রতিটি গাছে ৪০-৫০টি শাখার ১/২টি প্রশাখা রেখে বাকী শাখা ছেঁটে ফেলতে হবে, শাখা কাটার পর ছত্রাকনাশক দিতে হবে।

সেচ ঃ ড্রাগন ফলের গাছে তেমন সেচ লাগে না। তবে মাটির রসের অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেচ অবশ্যই দিতে হবে। আর দুই সারি গাছের মাঝখানে নালা থাকবে। যেখান থেকে জমা জল বেরিয়ে যেতে পারে।

ফসল ঃ ১২-১৮ মাসের মধ্যে গাছে ফল ধরে। এক বছরের একটি গাছ থেকে ৫-২০টি ফল পাওয়া যায়। আর একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে ২৫-১০০টি ফল পাওয়া যেতে পারে। একবার গাছ লাগালে ২০-৪০ বছর ফল পাওয়া যেতে পারে। এরকম ১ বিঘা জমি থেকে ২.৬-৪.০ টন ফলন পাওয়া যায়।

রোগ-পোকার আক্রমন ও নিয়ন্ত্রন ঃ গাছে ও ফলে খুব বেশি রোগ-পোকার আক্রমণ হতে দেখা যায় না। তবে অনেক সময় কান্ড ও গোড়া পচা রোগ হতে দেখা যায়।

কান্ড ও গোড়া পচা রোগ ঃ ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া দ্বারা এই রোগ হতে থাকে। আক্রান্ত গাছের কান্ড প্রথমে হলুদ পরে কালো রং ধরে, পরবর্তীতে ঐ স্থানে পচন শুরু হয় এবং তা বাড়তে থাকে।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে বা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। পরে প্রতি লিটার জলে-কার্বেনডাজিম - ১গ্রাম বা কপার অক্সি-ক্লোরাইড ৪ গ্রাম ভাল ভাবে স্প্রে করতে হবে।

বাদামী দাগ ঃ আক্রান্ত গাছের ডগা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। সময় মত রোগ দমন না করলে গাছ শুকিয়ে মরে যায়।

প্রতিকার ঃ কান্ড পচা রোগের মত।

ড্রাগন ফল গাছে অনেক সময় জাব পোকা ও দয়ে পোকার আক্রমন করে থাকে। জাব পোকার বাচ্চা বা পূর্ণ পোকা গাছের কচি শাখায় বসে রস চুষে খায়। ফলে আক্রান্ত শাখা ও ডগার রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়।
এই পোকারা শাখার ওপর আঠালো রসের মত মলত্যাগ করায় শুটি মোল্ড নামক ছত্রাক রোগের সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার ঃ প্রতি লিটার জেল ম্যালাথিয়ান ২ মিলি বা সাইপারমেথ্রিন ২ মিলি প্রতি লিটার ভাল ভাবে গুলে প্রয়োগ করতে হবে।

পেয়ারা চাষ

বিভিন্ন ফলের মধ্যে পেয়ারার চাষ অত্যন্ত লাভজনক, কারণ এটি বছরে তিনবার ফল পাওয়া যায় এবং যার বাজারের চাহিদাও খুব বেশি।

উন্নত জাত ঃ লক্ষ্মৌ -৪৯, আরকা মৃদুলা, আরকা অমূল্য এলাহাবাদ সফেদা, বারুইপুর, খাজা ইত্যাদি।

রোপণের সময় ঃ আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস (জুন থেকে সেপ্টেম্বর)।

রোপণের দূরত্ব ঃ ৫মি x ৫মি (১৫ ফুট x ১৫ ফুট)।

গর্তের আকার ঃ ২ ফুট x ২ ফুট x ২ ফুট।

গর্ত খোঁড়ার আগে সমস্ত জমিতে ফিতে বসিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে যেখানে গাছ লাগানো হবে সেগুলি চিহ্নিত করুন ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গর্ত খুঁড়ে রাখুন। গর্ত খোঁড়ার সময় নীচের অর্ধেক মাটি গর্তের বাঁ-পাশে ও উপরের মাটি গর্তের ডানপাশে রাখুন। এরপর এক সপ্তাহ ভাল করে রোদ খাওয়ান। ১ সপ্তাহ পরে নীচের অর্ধেক মাটির সাথে গোবর সার, সুপার ফসফেট ও উইপোকা-প্রবণ এলাকায় ৫০ গ্রাম কার্বোফুরান ভালো করে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করুন।

জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ ঃ

সার	গর্তপ্রতি	গাছ লাগানোর ১ বছর পর	পূর্ণমাত্রায় ফলন্ত গাছ
গোবর সার	২০ কেজি	২০ কেজি	৫০ কেজি
নাটট্রোজেন	-	৫০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
ফসফরাস	৮০	১০০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম
পটাশিয়াম	-	৫০ গ্রাম	২৫০ গ্রাম

পরিচর্যা ঃ ভালো ফলন পেতে হলে ে পেয়ারা গাছের নিয়মমতো ট্রেনিং ও ডাল ছাঁটা দরকার। ট্রেনিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্য হল শক্তপোক্ত কাঠামোর গাছ তৈরি করা, যাতে ঝড় বা ফলের ভারে ডাল ভেঙে না পড়ে। তাছাড়া ট্রেনিং-এর ফলে বাগান পরিচর্যার সুবিধা হয় এবং গাছ অনেকদিন ধরে ফলন দেয়। গাছ বসানোর প্রথম ৪ বছর ট্রেনিং করা হয়। প্রথম বছরে প্রধান কাণ্ডের নীচ থেকে বা শিকড় থেকে জন্মানো কিংবা জোড়-কলমের গাছের গোড়ার নীচ থেকে জন্মানো অবাঞ্ছিত ডাল ছেঁটে ফেলা হয়। দ্বিতীয় বছরে প্রধান কাণ্ডে মাটি থেকে ২-৩ ফুট ওপরে ৩-৪টি সবল ডাল রেখে বাকি ডাল ছেঁটে ফেলা হয়। এই ডালগুলি পরে কাণ্ডের চারদিকে স্থায়ী কাঠামো তৈরি হয়। তাছাড়া ওই উচ্চতার নীচ থেকে কোনো ডাল বের হলে তা ছেঁটে ফেলা হয়। তৃতীয় বছরে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিতে কাঠামোর ডাল থেকে যে সব খাড়াই লকলকে ডাল বের হয়, তা ছেঁটে ফেলা হয় তবে সমান্তরাল মজবুত বের হওয়া ডাল রেখে দেওয়া হয়। এই রাখা ডালগুলি পরবর্তী কালে ফল দেবে। চতুর্থ বছরে কাণ্ডের গোড়া ও শিকড় থেকে গজানো ডাল ছাঁটা হয়। ঠিকমতো ট্রেনিং প্রদ্ধতি অবলম্বন, সার প্রয়োগ ও সঠিক সময়ে সঠিক মাত্রায় কৃটনাশক প্রয়োগ করে রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ করলে গাছে পরিমাণমতো ফল ধরবে।

ফলন নিয়ন্ত্রণ ঃ

সাধারণভাবে পেয়ারাগাছে তিনবার ফুল আসে ফাল্গুন-বৈশাখের ফুল, ফল তোলার উপযোগী হয় আষাঢ়-ভাদ্রে, একইভাবে আষাঢ়-শ্রাবণের ফুলে ফল আসে অগ্রহায়ণ-মাঘ মাসে এবং আশ্বিন-কার্তিকের ফুলে ফল ধরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে। বর্ষার ফল ধরে বেশি, কিন্তু স্বাদ পানসে হয়। শীতে বেশি ফল পাওয়ার জন্য চৈত্র-বৈশাখ থেকে সেচ বন্ধ করে জ্যৈষ্ঠের প্রথমে বাগানের মাটি খুঁড়ে আলগা করে দেওয়া হয়, কিছুদিন পর গাছের ফুল, ফল ও কিছু পাতা ঝরে যায়। জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সুপারিশ মাত্রায় সার প্রয়োগ করে সেচ দেওয়া হয়। এর ফলে আষাঢ়ে প্রচুর ফুল আসে ও অগ্রহায়ণ-মাঘে ফল তোলার উপযুক্ত হয়। এই পদ্ধতি বারবার অবলম্বন করা উচিত নয়, কারণ এতে গাছের আয়ু কমে যায়।

এছাড়াও কোনো নিদিষ্ট ডালে বেশি ফুল-ফল পেতে লম্বা ডাল বাঁকিয়ে অন্য ডালের সাথে বা খুঁটির সাথে বেঁধে দেওয়া হয়। ফলে ওই ডালে প্রচুর নতুন শাখা -প্রশাখা আসে ও তাতে ফুল ধরে। এ পদ্ধতিটিও নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এতেও গাছ দুর্বল হয় ও রোগপোকায় সহজে আক্রান্ত হয়।

ফলনঃ পেয়ারার ফলন নির্ভর করের জাত, গাছের বয়স, কোন ঋতুর ফল, পরিচর্যা ইত্যাদির উপর। একটি প্রাপ্ত বয়স্ক পেয়ারাগাতছ গড়ে ৮০-৯০ কেজি ফলন দেয়।

রোগপোকা ও তার প্রতিকার ব্যবস্থা ঃ

১) **ফল ছিদ্রকারী পোকা ঃ** ফল ছিদ্র করে তার মধ্যে ঢুকে যায়, ফল ঝরে পড়ে ও ফলন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রতিলিটার জলে কার্বারিল (২.৫ গ্রাম) / নিমতেল (২ মি.লি.) স্প্রে করলে উপকার পাওয়া যায়।

২) **ডগা ছিত্রকারী পোকা ঃ** পোকার শুককীটগুলি নরম ডগায় ফুটো করে ঢুকে মজ্জার অংশ খায়। এর ফলে আক্রান্ত ডগা মুকুল সমেত শুকিয়ে যায়। ফসফমিডন (প্রতি লিটার জলে ৩/৪ মি.লি.) বা ডাই-ক্লোরভস (প্রতি লিটারে ১.৫ মি.লি.) স্প্রে করতে হবে।

৩) **দয়ে পোকা ঃ** এই পোকা দলবদ্ধভাবে রস শুষে খায়। দেখে মনে হয় যেন দইয়ের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ডালগুলো দুর্বল হয়ে যায় এবং ফলের স্বাভাবিক স্বাদ থাকে না। মনোক্রোটোফস বা ডাইমেথোয়েট প্রতি লিটার জলে দেড় মি.লি. হারে গুলে নিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৪) **ফলের মাছি ঃ** এই মাটি ফলের শাঁস খেয়ে নেয়। ম্যালাথিয়ন দেড় এম. এল প্রতি লিটার জলে গুলে ১৫/২০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে।

৫) **ঢলে পড়া ঃ** ডালের আগার দিক থেকে পাতা হলদে হয়ে ঝরে পড়ে। ডাল ও পুরো গাছ আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। সুষম সার প্রয়োগ, গাছের গোড়ায় জল জমতে না দেওয়া, আক্রান্ত গাছ ও গাছের গোড়ার মাটিতে কার্বেন্ডাজিম (২ গ্রাম) প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়।

উন্নত উপায়ে ব্রোকলি চাষ

বৈচিত্রময় শীতকালীন সবজির মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি ইত্যাদি সুপরিচিত কপির পরিবারে ব্রোকলি বা 'সবুজ ফুলকপি' আমাদের কাছে নতুন সংযোজন। মূলত আমেরিকা, ইউরোপে পরিচিত হলেও বিগত ১০-১২ বছর ধরে আমাদের দেশেও সবুজ ফুলকপি বা স্প্রাউটিং ব্রোকোলির চাষ হচ্ছে এবং এটি ক্রমশঃ জনপ্রিয়তা লাভ করছে। পুষ্টিকর এই কপির চাষ খুবই লাভজনক।

ব্রোকলি সাধারণত হালকা সবুজ রঙের হয়, তবে ততটা জমাট বাঁধা নয়। এর খাদ্যাংশ বা 'কপি' (ইংরাজীতে 'হেড' বলা হয়)। সাধারণ কপির মতো দেখতে হলেও কিন্তু আসলে তা এক নয়। এটি অনেক ফুলের অপরিণত কুঁড়ি বা মঞ্জুরীর সমাবেশ। তাই ব্রোকলির ফুলগুলি জমাট না বেঁধে ছাড়া ছাড়া অবস্থায় থাকে। লম্বা পুষ্পদন্ড বা কান্ডের উপর অবস্থিত সুস্বাদু ও সুগন্ধী এই কপি সাধারণত হালকা থেকে মাঝারি ওজনের (৪০০-৫০০ গ্রাম) হয়। গাছের ডগার বড় আকারের সবুজকপি কেটে নিলে এর নিচের পাতার কান্ডের কোল থেকে আরো দু-একটি ছোট আকারের কপি বের হয়।

এছাড়া ফুলকপির মতো জমাট বাঁধা বেগুনী/লালচে খয়েরী রঙের ব্রোকলিও দেখা যায়।

উপকারীতা ঃ

ক্যানসার প্রতিরোধক ক্ষমতার (সালফোর‍্যাফেন) পাশাপাশি এই কপিতে যথেষ্ট পরিমাণ ফ্ল্যাভোনয়েড, অ্যান্টি অক্সিজেন্ট ভিটামিন, প্রটিন, খনিজও লবণ থাকে। কোলেস্টেরল কম থাকায় হৃদরোগের সম্ভবনা কমায়। এই কপিতে ফুলকপির তুলনায় ১৩০ গুণ এবং বাঁধাকপির চেয়ে ২২ গুণ বেশি ভিটামিন-এ আছে। এই জন্য এখন ব্রোকলিকে পুষ্টির মণি মুকুট (jewel Crown of Nutrition) বলা হয়।

ব্রোকোলি কাঁচা অবস্থায়, স্যালাড করে, সেদ্ধ, সুপ বা তরকারি করে খাওয়া হয়।

জলবায়ু ঃ

ব্রোকলি শীতকালীন সবজি। গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য ২০-২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং কুঁড়ি তৈরীর সময় ১২-১৮ডিগ্রি সেঃ তাপমাত্রার প্রয়োজন। এর বেশী তাপমাত্রায় সবুজ ফুলকপি সাধারণত জমাট না বেঁধে আলগা হয়ে যায়।

জমি ও মাটি ঃ

মাঝারি ও উঁচু অবস্থানের জল নিকাশের সুব্যবস্থা আছে এমন খোলামেলা জৈব পদার্থযুক্ত উর্বর মাটির জমি ব্রোকলি চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। মাটির পি.এইচ. মান ৫.৫-৬.৫ থাকা দরকার।

চাষের সময় ঃ

ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি থেকে অগ্রাহায়ণ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বীজ বুনতে হবে। এক বারে সব বীজ না বুনে ১৫ দিন অন্তর পর্যায়ক্রমে বা খেপে খেপে বীজ বুনলে দীর্ঘ দিন ধরে ফসল তোলা যায়। তবে ছায়াজালের ঘরে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষ করে উৎকৃষ্ট মানের ব্রোকলি উৎপাদন করা সম্ভব।

জাত প্রকরণ ঃ

বাজারে সবুজ রঙের নিবিড় ও জমাটবাঁধা জাতের ব্রোকলির চাহিদা বেশি। এই জাতগুলি জলদি, মাঝারি ও নাবি শ্রেণীতে বিভক্ত।

সারণীতে বৈশিষ্ট্য সহ কয়েকটি উন্নত জাতের বিবরণ দেওয়া হল ঃ

জাতের নাম	শ্রেণী	গড় ওজন	মেয়াদ কাল (দিন)	গড় ফলন/বিঘা	রঙ	বৈশিষ্ট্য
পালাম সমৃদ্ধি	মাঝারি	৩০০-৪০০ গ্রাম	১৪০-১৫০	৩০ কুই	গাঢ় সবুজ	জমাট বাঁধে
পালাম কাঞ্চন	নাবি	৫০০ গ্রাম	১৪০-১৪৫	৩৫ কুই	হলদে সবুজ	কম জমাট বাঁধে
পালাম বিচিত্রা	মাঝারি	৪৫০ গ্রাম	১১৫-১২৫	৩০ কুই	হালকা বেগুনী	জমাট বাঁধে/সুগন্ধ যুক্ত
পালাম হরিতিকা	মাঝারি	৩৭৫ গ্রাম	১৪০-১৫০	৩০ কুই	গাঢ় সবুজ	জমাট বাঁধে

সংকর বা হাইব্রিড জাতের মধ্যে গ্রীনম্যাজিক (তাপমাত্রা সহনশীল, সুষম গঠন, সবুজ নীলচে রঙ, রোপনের ৬০ দিন পরে ফসল তোলা যায়) জাতটি খুবই জনপ্রিয়। সি.এস.এক্স-৩৫১০০, আর.টি.এক্স-০৭৮৮ জাত গুলির কিছুটা তাপমাত্রা সহনশীলতা আছে। এছাড়া প্যাকম্যান, পাইরেট, লাকি, শিশির, ফিস্তা, গ্রীন গোলিয়াথ, ক্যালাব্রেশ, পুষ্প, ম্যারাথন (নাবি জাত), পাঞ্জাব ব্রোকলি-১, পুসা ব্রোকলি সিলেকশন-১ ইত্যাদি জাতের নাম করা যায়।

বীজের হার ঃ

এক বিঘা জমি চাষের জন্য উন্নত জাতের বেলায় ৫০-৬০ গ্রাম এবং হাইব্রিড জাতের ক্ষেত্রে ৩০ গ্রাম বীজ দরকার হয়।

বীজশোধন ঃ

বোনার আগে অবশ্যই প্রতি কেজি বীজের জন্য ৫ গ্রাম হারে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি অথবা ২ গ্রাম হারে কার্বেন্ডাজিম দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।

চারা তৈরী ঃ

অন্যান্য কপি ফসলের মতো বীজতলায় বীজ বুনে ব্রোকলির চারা তৈরী করতে হয়। বীজ বোনার আগে বীজতলার মাটি ৪৫ গেজ পাতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে তিন সপ্তাহ রোদ খাইয়ে নিতে হবে। এক বিঘা জমি চাষের জন্য এক মিটার চওড়া, তিন মিটার লম্বা, এবং ২০-৩০ (জলদি চাষে) সেমি উচ্চতার আয়তন বিশিষ্ট দুটি বীজতলার দরকার, উঁচু ও খোলামেলা জায়গায় বেশ কয়েকবার ভালভাবে চাষ দিয়ে বীজতলা তৈরী করা হয়। এই মাপের একটি

বীজতলাতে ২০-২৫ কেজি কেঁচোসার বা ভালোভাবে পচা গোবর সার, ৫০০ গ্রাম নিম খোল, ২৫০ গ্রাম সিঙ্গল সুপার ফসফেট, ১০০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ এবং ৫ গ্রাম সোহাগা বীজ বোনার দু-তিন দিন আগে বীজতলার শোধন করা মাটির সঙ্গে ঠিকমতো মিশিয়ে দিতে হবে।
বীজতলায় সারি থেকে সারি ৫ সেমি (২ ইঞ্চি) এবং বীজ থেকে বীজ ২.৫০ (এক ইঞ্চি) দূরত্ব রেখে এক সেমি গভীরে বীজ বোনা দরকার। অতিরিক্ত তাপ বা রোদ বৃষ্টি এবং ধূলিকণা থেকে চারাগাছকে রক্ষা করার জন্য বীজতলার ওপর ১.৫০ মিটার (৫ ফুট) উঁচু অর্ধগোলাকার পলিথিনের ছাউনি দিতে হয়। এর চার পাশে মশারীর জাল দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে। ৪-৫ সপ্তাহ বয়সের চারা মূল জমিতে রোপনের উপযুক্ত হয়। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ছায়াজালের ঘরে পলিথিনের প্লাগ ট্রে ব্যবহার করে চারা উৎপাদন লাভজনক।
কোন নির্দিষ্ট এলাকার জন্য সব বীজ একসাথে না বুনে ১৫ দিন অন্তর পর্যায়ক্রমে বীজ বুনতে পারলে অপেক্ষাকৃত বেশী দিন ধরে ফসল তোলা যাবে।

জমি তৈরী ঃ

লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি ভাবে ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে এবং আগাছা বেছে জমি ঝুরঝুরে করা হয়। প্রথম চাষ দেবার সময় জৈবসার ও নিম খইল মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। মই দিয়ে জমি সমান করার পর মূল জমিকে ১.২০ মিটার (৪ ফুট) চওড়া ও ঢাল অনুযায়ী সুবিধামতো দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ভূমিখন্ড/কেয়ারী বা প্লটে ভাগ করে নিতে হবে। দুটি কেয়ারীর মধ্যে ৩০ সেমি (এক ফুট) চওড়া জল নিকাশী নালা রাখতে হবে।

চারা রোপন ঃ

সারি থেকে সারি ৪৫ সেমি (১.৫০ ফুট) এবং চারা থেকে চারা ৪৫ সেমি (১.৫০ ফুট) দূরত্ব রেখে চারা রোপন করা হয়। এক বিঘা জমির জন্য প্রায় ৬০০০টি চারা লাগবে। জলদি জাতের বেলায় উঁচু ভেলী করে চারা রোপন করতে হবে। চারার শিকড় বা সম্পূর্ণ চারা এক শতাংশ (১০ গ্রাম/লিটার) ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি দিয়ে (২০-৩০ মিনিট) শোধন করে বিকাল বেলায় রোপন করতে হবে। রোপনের পর অন্তত দু-তিন দিন কাগজ, বড় পাতা বা কলাগাছ কাণ্ডের টুকরো দিয়ে চারা ঢেকে রাখা দরকার।

সার প্রয়োগ ঃ

মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে সার প্রয়োগ করতে হয়। নতুবা জমিতে প্রথম চাষের সময় বিঘা প্রতি এক টন কেঁচো সার, দুটন পচা গোবর সার এবং ১০০ কেজি নিম খইল প্রয়োগ করা দরকার। রাসায়নিক সার হিসাবে বিঘা প্রতি ৬.৫০ কেজি নাইট্রোজেন (প্রায় ১৪ কেজি ইউরিয়া), ১২ কেজি ফসফরাস (৭৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট) এবং ৫ কেজি পটাশ (৮ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ) ঘটিত সার শেষ চাষের সময় মিশিয়ে দিতে হবে অথবা সম্ভব হলে এই সার চারা রোপনের দু'দিন আগে কেয়ারীতে সারি বরাবর প্রয়োগ করা যেতে পারে।

চাপান সার প্রয়োগ ঃ

চারা রোপনের ২১ দিন পর প্রথম বার এবং ৪২ দিন পর দ্বিতীয় বার বিঘা প্রতি ৩.৫০ কেজি নাইট্রোজেন (প্রায় ৭.৭৫০ কেজি ইউরিয়া) এবং পটাশ সার ৩ কেজি (৫ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ) হারে চাপান সার হিসাবে সারি বরাবর প্রয়োগ করতে হবে। চাপান সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হয়। মাটিতে রস না থাকলে হালকা সেচ দেওয়া দরকার।

জীবাণু সার প্রয়োগ ঃ

মূল সার এবং চাপান সার প্রয়োগের সাত দিন পর বিকালবেলায় বিঘা প্রতি এক কেজি হারে অ্যাজাটোব্যাক্টর ও ফসফরাস দ্রবণীয় ব্যাক্টেরিয়াজাত জীবাণু সার ৭-৮ কেজি কেঁচো সারের সঙ্গে মাটিতে প্রয়োগ করলে আগে বলা মোট রাসায়নিক নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সার প্রয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ কমানো যায়।

অনুখাদ্য প্রয়োগ ঃ

এই ফসল চাষে অনুখাদ্য বিশেষত বোরন ও মলিবডেনামের প্রয়োজনীয়তা আছে।

শারীরবৃত্তীয় উপসর্গ ঃ

মলিবডেনামের অভাবে কপির পাতা সরু হয়, পাতা কুঁকড়ে কাস্তের মতো বেঁকে যায়। ফুলের চেহারা স্বাভাবিক থাকে না। মাটিতে বোরনের অভাব হলে ব্রোকলি ঠিকমতো জমাট বাঁধে না, বাদামি রঙের হয়, কান্ডের ভিতর ফাঁপা হয়, কপি পচে যায়।
এই সমস্যা প্রতিকারের জন্য প্রতি ১০ লিটার জলে ২০ গ্রাম সোহাগা বা ১০ গ্রাম সল্যুবোর এবং এক গ্রাম সোডিয়াম মোলিবডেট মিশিয়ে প্রতি বিঘা জমিতে ৮০-১০০ লিটার স্প্রে করতে হবে।
এই পরিমাণ মিশ্রণে আঠা (স্টিকার বা স্প্রেডার) দিয়ে বীজতলায় চারা গাছে এবং মূল জমিতে চারা রোপনের পর ১৫-২০ দিন অন্তর কমপক্ষে দুবার পাতায় স্প্রে করা দরকার।

অর্ন্তবর্তী পরিচর্যা

আগাছা নিয়ন্ত্রন ঃ

সবুজ ফুলকপির ক্ষেত সর্বদা পরিষ্কার রাখা জরুরী। রোপনের পর চারার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিতে আগাছা জন্মায়। চাপান সার প্রয়োগের একদিন

আগে প্রতি বার হালকা নিড়ানী দিয়ে জমির আগাছা বেছে ফেলা দরকার।

ফসলের সঠিক বৃদ্ধি ও ভাল ফলনের জন্য জমিতে দরকার মতো ভাল সেচ দিতে হবে। চারা রোপনের পর প্রথম কয়েকদিন হালকা ভাবে সেচ দিতে হবে। এরপর মাটিতে রসের অবস্থা বুঝে ১০-১৫ দিন অন্তর প্রয়োজন মতো সেচ দিতে হবে। ফুলের কুঁড়ি ধরার সময় সেচের বিশেষ প্রয়োজন। বর্তমানে অনুসেচ ব্যবস্থার বিন্দু বিন্দু (ড্রিপ) পদ্ধতিতে সেচ দিয়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত জলের খরচ বাঁচানো যায়। মাটি শুকনো থাকলে কপির গুণমান ও ফলনে প্রভাব পড়ে।

আচ্ছাদনের ব্যবহার ঃ

চারা রোপনের পর সারি বরাবর খড়, শুকনো পাতা বা পলিথিন আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় এবং জলসেচের পরিমাণ কমে।

ফসল তোলা

জাত অনুসারে চারা রোপনের সাধারণত ৬০-৮০ দিনের মধ্যে ব্রোকলি তোলা হয়। কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটার আগে কপি সবুজ ও জমাট বাঁধা অবস্থা থাকতেই ফসল তুলতে হবে। সকাল বেলায় কপির নীচে ১০-১৫ সেমি (৪-৬ ইঞ্চি) কান্ড সমেত ধারালো ছুরির সাহায্যে কেটে নিয়ে এই কপি তোলা হয়। ফসল তুলতে দেরী করলে কপি আলগা ও ছাড়া ছাড়া হয়ে যায় এবং কুঁড়ি অবস্থাতে ফুল ফেটে গেলে কপির বিক্রয়যোগ্যতা কমে যায়।

সাধারণত ৪-৬ সপ্তাহ ধরে ফসল তোলা চলে। তোলার পর ব্রোকলিকে সাধারণ তাপমাত্রায় ৩-৪ দিনের বেশী রাখা যায় না। তাই দ্রুত বিপনন ব্যবস্থাপনা করা জরুরী। ফসল তোলার পর চারদিকের পাতা দিয়ে কপির উপর ঝুঁটি বেঁধে প্লাস্টিক ক্রেটে ভরে বাজার জাত করতে হবে। দুরবর্তী স্থানে বাজার জাত করার জন্য ৫ শতাংশ বায়ু চলাচল করতে পারে এমন পাঁচ কেজি ওজন বহনক্ষম ঢেউখেলানো শক্ত কাগজের বাক্স ব্যবহার করতে হবে।

কীটশত্রু ঃ

সাদা বরফি পিঠ মথ / সরুই বা সুতলি পোকা ঃ

ব্রোকলির মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা। পোকার লেদা প্রথমে পাতার ভিতরের সবুজ অংশ খায়। উপরের অংশ অক্ষত থাকে, পাতা ঝাঁঝরা হয়ে জানালার মতো দেখতে হয়। এরপর পাতা, কুঁড়ি নষ্ঠ হয়। শীতকালের শেষ ভাগে এদের আক্রমণ বেশী হয়।

লেদা পোকা ঃ

ছোট সাদা মথের সবুজ রঙের লেদা ঝাঁকে ঝাঁকে পাতার নীচে বসে দ্রুত গোগ্রাসে পাতা খায়, পাতা ঝাঁঝরা হয়ে যায়।

ঘোড়া/তিড়িং পোকা ঃ চকচকে সবুজ রঙের এই পোকা পাতার নানা স্থানে ছিদ্র করে পাতা ও গাছের ক্ষতি করে।

করাত মাছি ঃ এই পোকার শুককীট দশা বা কীড়া কচি ও নরম পাতা খেয়ে নষ্ট করে। আক্রান্ত গাছের পাতার মাঝখানের শিরা ছাড়া বাকী অংশ পোকারা সম্পূর্ণ খায়। গাছ বাড়ে না, ফলন কমে যায়।

জাব পোকা ঃ এই পোকার পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ দশা ঝাঁকে ঝাঁকে পাতা ও ফুলের বিভিন্ন অংশের রস চুষে খায়। পাতা কুঁকড়ে যায়। ব্রোকলি ব্যবহার ও বিক্রয়ের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

সুসংহত পদ্ধতিতে কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণ ঃ

পোকায় আক্রান্ত হলে প্রথমেই শুধুমাত্র বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার না করে সুসংহত উপায়ে কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি অনুযায়ী ক্ষেতের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, সঠিক শস্য পর্যায় গ্রহণ, বীজ ও চারা শোধন, সরিষা (১৬ সারি অন্তর) দিয়ে শস্য ফাঁদ, টমাটো বা লংকার অন্তর চাষ, ক্ষেতের চার পাশে রেড়ি গাছের জমিতে পাখি বসবার ও ফেরোমেন ফাঁদ এবং আলোক ফাঁদের (বিঘা প্রতি ২-৩টি) ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রাইকোর্ডামা বোলতা যুক্ত ট্রাইকোকার্ড জমিতে ব্যবহার ফলপ্রসু। দেখামাত্রা শত্রু পোকার ডিমের গাদা নষ্ট করা দরকার। এরপর নিম (৫ শতাংশ বীজের নির্যাস) বা উদ্ভিদজাত কীটনাশক ও জীবাণু-জাত কীট নাশক (বি.টি-০.১ শতাংশ) বা এন.পি ভাইরাস এর প্রয়োগ বেশ কার্যকর। প্রয়োজনে এবং শেষ উপায়ে হিসাবে অতিকম বিষযুক্ত এবং প্রয়োগের অল্পকালের মধ্যে কার্যকারীতা নষ্ট হয় এমন নিরাপদ রাসায়নিক কীটনাশক যেমন কার্বারিল (০.২৫ শতাংশ) বা অ্যাসিফেট ০.১০ শতাংশ) বা কারটাপ হাইড্রোক্লোরাইড (০.১০ শতাংশ) বা নোভালিউরন (০.১০ শতাংশ) অথবা ইমিডাক্লোপ্রিড (০.০২০ শতাংশ) ব্যবহার করা যাবে।

রোগ

চারা ধ্বসা ঃ

সাধারণত বীজতলায় ছত্রাক জনিত রোগে আক্রান্ত পাতা হলদে হয়ে চারা গাছ ঢলে পড়ে। কান্ডের গোড়া লম্বালম্বি কাটলে মাঝখানে হলদে রঙের নালি দেখা যায়। সাধারণত বীজতলায় ছত্রাক জনিত এই রোগে আক্রান্ত পাতা হলদে হয়ে যায়। গোড়ার অংশে জলবসা দাগ হয়, চারা গাছ সম্পূর্ণ ঢলে পড়ে।

গোড়া পচা / শিকড় পচা ঃ

ছত্রাক ঘটিত এই রোগে আক্রান্ত গাছের মাটি সংলগ্ন কাণ্ডের অংশ কালো হয়ে পচে যায়, গাছ ধীরে ধীরে আলগা হয়ে শুকিয়ে যায়। অনেক সময় কান্ডের ছাল আলগা ও নরম হয়ে যায়, ভিতরের শক্ত অংশ বের হয়ে গাছ মরে যায়। চারা তলায় এই রোগ বেশী হয়।

পাতার কালো শিরাপচা (এক পেশে রোগ) ঃ

ব্যাকটেরিয়া ঘটিত এই রোগের আক্রমণে বীজতলার চারার পাতা ক্যাকাসে হলদে ও কালো হয়ে ঝরে পড়ে। পাতার কিনারা থেকে আক্রমণ শুরু হয় ও ধীরে ধীরে তা ভিতরের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত অংশ ফ্যাকাসে হয়ে শুকিয়ে যায়। শিরা উপশিরাগুলি বাদামী ও পরে কালো হয়ে পচে যায়। গাছের একদিক আক্রান্ত হলেও অন্য দিকের পাতা ভাল থাকে। তাই এই রোগটি 'এক পেশে রোগ' নামে পরিচিত।

সাদা মরিচা রোগ ঃ

সাদা চকচকে উঁচু ক্ষুদ্রাকার বিন্দু বিন্দু দাগ পাতার উপরে দেখা যায়। এরা পরে মিলেমিশে বড় দাগে পরিণত হয়। ফুল, কুঁড়ি বা মঞ্জুরী এই রোগে আক্রান্ত হয়।

সাদা ছাতা বা ডাউনি মিলডিউ ঃ

ছত্রাক ঘটিত এই রোগের আক্রমণে গাছের কান্ডের বেশী ক্ষতি হয়। পাতার উপরে হলুদ রঙের ছোপ ছোপ দাগ দেখা যায়, পাতার নিচে ছোপের বিপরীতে সাদা বা বাদামী ছাপ দেখা যায়। এই দাগ পরে পচন ধরে কান্ডে ছড়িয়ে পড়ে।

ডাঁটা পচা রোগ ঃ

পাতার বোঁটা ও কান্ডের সংযোগস্থলে প্রথমে জলে ভেজা দাগ দেখা যায়, পরে দাগগুলি সাদা হয়। কান্ডের ভিতর পচতে শুরু করে, পাতা হলদে হয়ে ঝরে পড়ে।

শিকড় ফোলা ঃ

ছত্রাক জনিত এই রোগের আক্রমণে গাছ বাড়ে না, ফ্যাকাসে ও ছোট থেকে যায়। মাটির নীচে আক্রান্ত শিকড় গদার মতো ফুলে ওঠে।

সুসংহত পদ্ধতিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ ঃ

পরিচর্যাগত ব্যবস্থাপনা যেমন উঁচু/মাঝারি উঁচু, খোলামেলা ও জল নিকাশের উন্নত সুব্যবস্থাযুক্ত জমিতে চাষ, পূর্ববর্তী ফসলের গোড়া ও আগাছা তুলে ফেলা, সবুজ সার ও জৈব সার তথা জীবাণু সারের ব্যবহার, জৈব সারের সঙ্গে ট্রাইকোডার্মা (২ কেজি/বিঘা) মিশিয়ে মাটিতে প্রয়োগ বা সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স যুক্ত কেঁচো সার ও সুষম মাত্রায় রাসায়নিক প্রয়োগ করতে হবে। পরপর একই জমিতে কপি বা সরষে জাতীয় ফসল চাষ না করা অর্থাৎ সঠিক শস্য পর্যায় গ্রহণ, বীজ, বীজতলা ও চারা শোধন করা আবশ্যক। এর পর শেষ উপায় হিসাবে সাদা ছাতা রোগ নিয়ন্ত্রণে ০.২৫ শতাংশ জিনেব বা ম্যানকোজেব এবং ডাঁটা পচা রোগ নিয়ন্ত্রণে ০.১ শতাংশ কার্বেন্ডাজিম প্রয়োগ করতে হবে।

এছাড়া কালো শিরাপচা রোগে স্ট্রেপটোসাইক্লিন ৫০ পি.পি.এম (২০ লিটারে একগ্রাম) হিসাবে বীজ শোধন এবং বড় গাছে রোগ হলে স্ট্রেপটোসাইক্লিন ১০০ পি.পি.এম (১০ লিটারে এক গ্রাম এবং ৪০ গ্রাম কপার অক্সি ক্লোরাইড) হারে ১০-১২ দিন অন্তর ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

এক বিঘা ব্রোকলি চাষ করতে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ পড়ে। বিঘা প্রতি কমপক্ষে ৫০০০টি ফলন হলে ৬০,০০০-৭০,০০০ টাকা লাভ রাখা কঠিন নয়।

কেঁচোসার উৎপাদনের উন্নত পদ্ধতি

প্রাচীন কাল থেকেই কৃষিকাজে জৈব সারের ব্যবহার চলে আসছে। গত শতাব্দীতে ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে কৃষি বিপ্লব তথা অধিক খাদ্য উৎপাদনের মূলে ছিল উচ্চফলনশীল জাত, রাসানিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার। কিন্তু কয়েক বছর পর দেখা গেল যে এই সব কৃষি উপাদান বেশী বেশী ব্যবহার করেও একই জমিতে খাদ্য উৎপাদন আর বাড়ছে না, ফলন কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ কৃষি জমিতে মাটির উর্বরতা কমছে, আর জল মাটি বাতাসের পরিবেশ দূষণ বেড়ে চলছে। একথা আমাদের সবার জানা জমির উর্বরা শক্তি বজায় রাখতে রাসায়নিক সারের সাথে জৈব সারের সঠিকভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু এত জৈব সার কোথায় কিভাবে পাওয়া যাবে? কি ভাবে কি দিয়ে তৈরী করা হবে? আর গর্ত করে কম্পোস্ট সার বানানো — তাও কম করে পাঁচ ছয় মাস লাগবে। যদি অল্প সময়ের মধ্যে ভালো মানের জৈব সার বানানো যায়-তবে চেষ্টা করা যেতে পারে।

ছোট বেলায় পড়েছি মাটিতে বসবাসকারী ছোট ছোট অমেরুদন্ডী প্রাণী 'কেঁচো' - কৃষকের বন্ধু, লাঙলের কাজ করে, 'প্রাকৃতিক কর্ষক' - এদের কর্মকান্ডের জন্য মাটির উর্বরতা ও ভৌত ধর্ম বজায় থাকে।

এই কেঁচোই আধুনিক কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এদের ব্যবহার করে অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতমানের জৈব সার তৈরী করা হচ্ছে।

গ্রীক ভাষায় কেঁচোকে বলা হয় ভার্মিস (Vermis)। কেঁচোর সাহায্যে তৈরী জৈব সার বা কম্পোস্ট, কেঁচোসার বা ভার্মিকম্পোস্ট নামে পরিচিত। শুধুমাত্র কেঁচোর বংশবিস্তার করানো বা কেঁচোর চাষ পদ্ধতিতে ভার্মিকালচার বলা হয়।

সমুদ্রতট থেকে বরফে ঢাকা পর্বতবাসী সারা পৃথিবী ব্যাপী প্রায় ৪২০০ প্রকার প্রজাতি থাকলেও আমাদের দেশে প্রায় ৫০০ ধরনের কেঁচোর প্রজাতি পাওয়া গেছে। বেশীর ভাগ কেঁচোই স্থলবাসী। বিভিন্ন ধরনের স্থলবাসী কেঁচোর মধ্যে কিছু থাকে মাটির উপর পচনশীল জৈব পদার্থে (এপিজেয়িক), কিছু মাটিতে সামান্য গর্ত খুঁড়ে, আবার কোন কোন কেঁচোর প্রজাতি মাটিতে গভীর গর্ত করে থাকে (এন্ডোজেয়িক)।

সামান্য পচা পাতা, কাঠ গোবর, ফল, শাক সবজির খোসা, আধপচা কম্পোস্ট প্রায় সব রকমের বিয়োজনশীল / পচনশীল জৈব পদার্থ কেঁচোর খাদ্য। বিভিন্ন প্রজাতির কেঁচোর খাদ্য গ্রহণের মাত্রা বিভিন্ন হলেও আদর্শ পরিবেশে দৈনিক গড়ে একটি কেঁচো দেহের ওজনের সমান বা বেশি খাদ্য গ্রহণ করে। শর্করা, নাইট্রোজেন, কম মাত্রার পলিফেনল যুক্ত পছন্দসই খাবারের সঙ্গে এরা মাটির পক্ষে উপকারী জীবাণু ও গ্রহণ করে। এই সব খাদ্য কেঁচোর খাদ্যনালীতে গিয়ে নানা প্রকার জৈব-রাসায়নিক পদার্থে ভেঙে যায় ও সমৃদ্ধ হয়।

এই জন্য কেঁচোর রেচনজাত বর্জ্য পদার্থ (মল ও দেহ থেকে বের হওয়া জৈব রাসায়নিক পদার্থ (Earthworm cast) ফসলের বিকাশ ও বৃদ্ধির সহায়ক। গাছের প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য প্রায় সব ধরনের উপাদান ছাড়াও এটি উৎসেচক, ভিটামিন, হরমোন ও উপকারী জীবানুতে ভরপুর। কেঁচো সার সাধারণত জৈব সার বা কম্পোস্টের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী ও উপকারী। কেঁচো সারকে **জৈব সারের রাজা** বলা যেতে পারে। সাধারণত উপযুক্ত পরিবেশে (২০-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ৩০-৪০ শতাংশ আর্দ্রতা) মাত্র ৫০ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে কেঁচো সার তৈরী করা যায়।

এছাড়া উপজাত কেঁচোসার ধোয়া জল (ভার্মি বেড ওয়াশ) জলে মিশিয়ে ছিটিয়ে ব্যবহার করে ফসলের গুণগত মান বাড়ানো যায়।

কেঁচো সারের গুণ ঃ

কেঁচো সার রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে মাটি ও ফসলকে রক্ষা করে। মাটির গঠন ও গ্রথনের উন্নতি সাধন করে মাটির স্বাস্থ্য বজায় রাখে। মাটিতে বায়ু চলাচল যেমন বাড়ে, মাটির জল ধারণ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। মাটিতে অবস্থিত ক্ষতিকর জীবাণুদের প্রতিহত করে উপকারী জীবাণুদের বেঁচে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করে এবং এদের সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে। ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেড়ে যায়। মাটির অম্ল ও ক্ষার মানের সমতা রক্ষা করে। রাসায়নিক সারের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায় ও অপচয় কমায়। এই সার উৎসেচক (সেলুলেজ, প্রোটিয়েজ, কাইটিনেজ, অ্যামাইলেজ, লাইপেজ ইত্যাদি) অ্যান্টিবায়োটিক, বৃদ্ধি সহায়ক উদ্দীপক (হরমোন-অক্সিন, জিব্বারেলিক অ্যাসিড), দরকারী অ্যামিনো অ্যাসিড এবং প্রয়োজনী অনুখাদ্যে ভরপুর। জৈব আবর্জনা কম খরচে সম্পদে পরিণত হয়। গ্রীণ হাউস গ্যাসের নিঃসরণ কমিয়ে পরিবেশ দূষণ কমায়। কেঁচো সারে বীজ সহজে অঙ্কুরিত হয়। গুটি কলম করার সময় এই সার ব্যবহার করলে দ্রুত শিকড় বের হয়। জমিতে কেঁচো সার ব্যবহার করলে ফসলের উৎকর্ষতা ঔজ্জ্বল্য ও সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়ে।

কিন্তু সাধারণ খামারজাত সার (F.Y.M) বা কম্পোস্ট সারে গাছের পুষ্টিগুণ কম থাকে, তৈরী করার জন্য দ্বিগুণের বেশি সময় (৫-৬ মাস) লাগে, দুর্গন্ধ ছড়ায় এবং পরিবেশ দূষিত হয়।

কেঁচো সার ও খামার জাত জৈবসারের খাদ্যগুণ এর তুলনা

ক্রমিক নং	খাদ্য উপাদান	কেঁচো সার	খামারজাত কম্পোস্ট
১	নাইট্রোজেন (শতকরা)	১.৬০	০.৭৫
২	ফসফেট (শতকরা)	২.৪৫	০.২৭
৩	পটাশ (শতকরা)	০.৮০	০.৫৫
৪	ক্যালসিয়াম (মিগ্রা / কেজি)	০.৪৪	০.৯১
৫	ম্যাগনেসিয়াম (মিগ্রা / কেজি)	০.১৫	০.১৯
৬	লোহা (মিগ্রা / কেজি)	১৭৫.২০	১৪৬.০০
৭	ম্যাঙ্গানিজ (মিগ্রা / কেজি)	৯৬.৫০	৬৯.০০
৮	দস্তা (মিগ্রা / কেজি)	২৪.৪৫	১৪.৫০
৯	তামা (মিগ্রা / কেজি)	৪.৮৯	২.০০

কেঁচো নির্বাচন ঃ

মাটির উপর বসবাসকারী (এপিজেয়িক), পচনশীল জৈব পদার্থ খেতে পছন্দ করে এমন স্বল্প জীবনচক্রযুক্ত দ্রুত বর্ধনশীল প্রজাতিক কেঁচোদের জৈব সার তৈরীর কাজে নির্বাচন করতে হবে। স্থানীয় কেঁচো ব্যবহার না করে ইসেনিয়া ফীটিডা (*Eisenia foetida*), ইউড্রিলাস ইউজেনি (*Eudrilus eugeniae*), পেরিওনিক্স এক্সাভাটাস (*Perionyx escavatus*) ফেরেটিমা ইলঙ্গাটা (*Pheretima elongata*) প্রভৃতি প্রজাতির কেঁচো ব্যবহার করতে হবে।

কেঁচো সার তৈরীর পদ্ধতিঃ

প্রকোষ্ঠ বা চৌবাচ্চা নির্মান, কেঁচো সার তৈরীর উপাদান সংগ্রহ ও আংশিক পচন, কেঁচোর বিছানা (ভার্মিবেড) তৈরী, কেঁচোর বিছানায় কেঁচো ছাড়া আংশিক পচানো জৈব আবর্জনা স্তরে স্তরে দেওয়া, চটের আচ্ছাদন দেওয়া, মাঝে মাঝে জল ছিটানো, ভার্মি কম্পোস্ট চয়ন ইত্যাদি পর্বে কেঁচো সার তৈরী করা হয়।

কেঁচো সার তৈরীর জন্য ছায়াযুক্ত উঁচু জায়গায় ছাউনির তলায় প্রকোষ্ট বা চৌবাচ্চা তৈরী করতে হবে। বিভিন্ন আয়তনের ও উপাদানের প্রকোষ্ঠে কেঁচোসার তৈরী করা যায়।

কেঁচো সার তৈরীর উপাদান ঃ

স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় পচনশীল জৈব আবর্জনা যেমন গোবর, ছাগলের মল, গোয়ালের বর্জ্য খড়, ফল, শাক সব্জির অব্যবহৃত অংশ, ধঞ্চে পাতা, সুবাবুল গাছের পাতা, শিম্বগোত্রীয় গাছের পাতা, সজনে পাতা, কলা ও পেঁপে গাছের পাতা ও কান্ড, শিকড় ছাড়া কচুরিপানা টোপাপানা ইত্যাদি আংশিকভাবে পচিয়ে ব্যবহার করা হয়। যদি একাধিক চৌবাচ্চা থাকে তবে আংশিক পচনের কাজটি যে কোন একটি চৌবাচ্চায় করা যেতে পারে।

কেঁচোর বিছানা (ভার্মিবেড) তৈরী ঃ

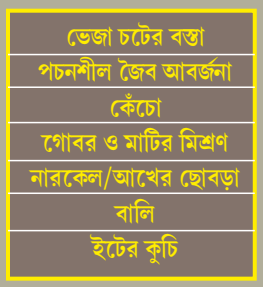

পাকা চৌবাচ্চাতে প্রথমে নীচের স্তরে দুই ইঞ্চি পুরু ইটের কুচি/টুকরো দিতে হবে। এর উপর এক ইঞ্চি বালি সমান করে বিছিয়ে দিতে হবে। বালির উপরে নারকেল / আখের ছোবড়া, শুকনো খড়, পাতা দিয়ে একটি দুই ইঞ্চি উঁচু স্তর করতে হবে। এই স্তরের উপর সমান অনুপাতে গোবর ও মাটির মিশ্রণ দিয়ে দুই তিন ইঞ্চির স্তর করে কেঁচো ছেড়ে দিতে হবে। এর উপর আধপচা জৈব আবর্জনা রেখে ভেজা চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

পচনশীল জৈব আবর্জনা তৈরী করার জন্য উপাদানগুলি টুকরো করে কেটে ১০% পচা গোবর জল মিশিয়ে ও ৭-৮ দিন রেখে আধপচা করে নিতে হবে।

জৈব আবর্জনার আংশিক পচনের সময় তাপ উৎপন্ন হয়, উত্তপ্ত অবস্থায় কেঁচো ছাড়া চলবে না। এক কেজি আধপচা জৈব আবর্জনার জন্য প্রায় ১০টি কেঁচোর দরকার হয় অথবা প্রতি বর্গ ফুট এলাকার জন্য ১০০টি কেঁচোর প্রয়োজন হয়। চৌবাচ্চা ভর্তি না হওয়া পর্যন্ত চটের ঢাকা সরিয়ে জৈব আবর্জনা দিতে হবে। ৩-৪ দিন অন্তর জৈব বস্তুর স্তর বাড়িয়ে যেতে হবে। কখনই জৈব বস্তুর স্তর একেবারে ৫-৬ ইঞ্চির বেশি দেওয়া উচিত নয়। মাঝে মাঝে আবর্জনা ওলটপালট করে বা উপর নীচ করে ঘেঁটে দিয়ে এবং প্রয়োজনে ২-৩দিন অন্তর জল ছিটিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে ৫০-৬০ দিনের মধ্যে কেঁচো সার তৈরী হয়ে যায়। ১০০০ কেজি আধপচা জৈব আবর্জনা থেকে প্রায় ২৫০-৩০০ কেজি কেঁচো সার পাওয়া যায়। কেঁচোসার ধোয়া জল (ভার্মিবেড ওয়াশ) নিষ্কাশনের জন্য চৌবাচ্চার মেঝে হালকা ঢালু করে কয়েকটি ছিদ্র রাখতে হবে।

কেঁচো সার সংগ্রহ ঃ

জৈব আবর্জনা দেওয়ার ৫০-৬০ দিন পর চটের ঢাকা তুললে যদি দেখা যায় উপরের স্তরটি গাড় বাদামী / কালচে, গোলাকার /লম্বাটে, ঝুরঝুরে, হালকা, দুর্গন্ধহীন দানায় পরিণত হয়েছে তবে বুঝতে হবে কেঁচোসার তৈরী হয়ে গেছে। চটের ঢাকা সরিয়ে কয়েকদিন জল দেওয়া বন্ধ করলে কেঁচো নিচের দিকে চলে যাবে। এই সার সংগ্রহ করে ছায়াযুক্ত স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে।

এর পর ৩-৪ বর্গমিমি ছিদ্রযুক্ত চালুনি দিয়ে ছেঁকে নিয়ে কেঁচো সার ব্যবহার করা হয় বা প্যাকেট জাত করা হয়। চালুনির উপরে পড়ে থাকা না পচা জৈব বর্জ্য, কেঁচো, কেঁচোর ডিম (কোকুন) আবার ব্যবহারের জন্য কেঁচো সার তৈরী করার প্রকোষ্ঠ বা চৌবাচ্চায় ছেড়ে দিতে হবে।

সতর্কতা ঃ

জৈব আবর্জনা বা কেঁচোর খাবার হিসেবে লেবু, তেঁতুল, রসুন, বা পেঁয়াজের খোসা, পার্থেনিয়াম, শেয়ালকাঁটা, হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যবহার করা চলবে না।

পাখি, ছুচো, কেঁচোর শত্রু। এদের থেকে কেঁচোদের রক্ষা করার জন্য চৌবাচ্চা বা প্রকোষ্ঠের উপর তারজাল বা মশারির জাল দিয়ে ফ্রেম বানিয়ে ঢেকে রাখা দরকার। ৩-৪ বর্গ মিলি মিটারের তারজাল দিয়ে ফ্রেম তৈরী করে ব্যবহার করলে এটি দিয়ে ছাঁকনির কাজ করা যাবে। লাল পিঁপড়ের আক্রমণ ঠেকাতে ১০ লিটার জলে ৫০ গ্রাম হিসাবে লবণ, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা, সাবানের গুড়ো মিশিয়ে চৌবাচ্চার চারপাশে ছিটিয়ে দিতে হবে। বৃষ্টির জল, সূর্যের আলো ও তাপ থেকে কেঁচোদের রক্ষা করার জন্য চৌবাচ্চার উপর ভালো ছাউনী থাকা প্রয়োজন।

কেঁচো সারের প্রয়োগ বিধি ঃ

মাঠের ফসল চাষের বেলায় বিঘা প্রতি এক টন, ফল চাষে গাছ প্রতি বয়স অনুযায়ী ২-১০ কেজি, টবে চাষ করলে টব প্রতি ১০০-২০০ গ্রাম হারে কেঁচো সার প্রয়োগ করা যায়।

এক কেজি কেঁচো সার তৈরী করতে প্রায় ৪ টাকা খরচ হয়, বাজারে কেজি প্রতি ৮ থেকে ১০ টাকায় এটি বিক্রি হয়। ৬০০ ঘনফুট আয়তনের জায়গার জন্য প্রতিবার ৫টন জৈব আবর্জনার দরকার হয় এবং তা থেকে ১.৫০ টন কেঁচো সার প্রস্তুত করা যায়। অর্থাৎ বছরে মোট চার দফায় ২০ টন জৈব আবর্জনার প্রয়োজন যার দাম কেজি প্রতি ৪০ পয়সা হলে মোট ৮০০০ টাকা খরচ পড়ে। উৎপাদিত মোট সম্ভাব্য কেঁচোসারের পরিমাণ ৬০০০ কেজি। প্রতি কেজি ৮ টাকা হারে বিক্রি হলে কমপক্ষে এক চল্লিশ হাজার টাকা বছরে লাভ করা যাবে।

খরিফ পেঁয়াজ চাষ

পশ্চিমবঙ্গে পেঁয়াজ একটি শীতকালীন সবজি হিসাবে পরিচিত। এই পেঁয়াজ সাধারণভাবে বাজারে আসে মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে। যদিও এই পেঁয়াজ রাজ্যের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে না পারলেও সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্বল্প খরচে সংরক্ষণ করা যায়। এই সময় বাইরের রাজ্যগুলি থেকে কমবেশি জোগানের ফলে পেঁয়াজের বাজার মূল্যে সে রকম কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। সেপ্টেম্বর পরবর্তী সময়ে রাজ্যে পেঁয়াজের ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিলক্ষিত হয়, যা চলে মার্চ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত। তখন পুরোপুরি তাকিয়ে থাকতে হয় অন্যান্য রাজ্যের দিকে, যেখানে বর্ষার মরশুমে পেঁয়াজ চাষ হয়। ওই সময়ে চাহিদার তুলনায় জোগান কম থাকায় বাজারে পেঁয়াজের দাম আকাশ-ছোঁয়া হয়ে যায়। অথচ কিছু জাত আছে যাকে বর্ষাকালে চাষ করে শীতের মরশুমের আগে ফসল তোলা যায় যখন এর বাজারদর বেশ চড়া। স্বাভাবিকভাবে বর্ষার মরশুমে রাজ্যে উঁচু জমিগুলিতে পেঁয়াজ চাষ করে এই সমস্যা অনেকটা কাটানো যাবে। ভালো ফলনে চাষির আয়ও যেমন বেড়ে যাবে সাথে সাথে অন্য রাজ্যগুলি থেকে পেঁয়াজ আমদানির পরিমানও কমানো যাবে।

জাত ঃ অ্যাগ্রিফাউন্ড ডার্ক রেড, এন-৫৩, আর্কা কল্যাণ, আর্কা প্রগতি, আর্কা নিকেতন, বসন্ত ৭৮০ ইত্যাদি।

জলবায়ু ঃ পেঁয়াজ একটি শীতকালীন সবজি। কম তাপমাত্রায় পেঁয়াজ গাছের বৃদ্ধি বা বাড় ভালো হয় এবং তুলনামূলকভাবে বেশি তাপমাত্রায় ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে কন্দের বৃদ্ধি ভালো হয়। তবে বর্ষার পেঁয়াজে জাতগুলি তুলনামূলকভাবে একটু বেশি তাপমাত্রাতে ভালো হয়। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৮-৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ১৪-১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই সময়ে পেঁয়াজের ফলনের পক্ষে সব থেকে বেশি উপযোগী। তাছাড়া অনেক জমিতে কম তাপমাত্রায় (১০-১২ ডিগ্রি সেলসিয়াস) কলি এসে যায়। যে গাছে কলি বা ফুল এসে যায় তার ফলন কম হয় এবং সেই পেঁয়াজ তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়।

মাটি ঃ যে কোনো প্রকার মাটিতে এই পেঁয়াজের চাষ করা যায়। পলি ও দোঁয়াশ মাটি পেঁয়াজ চাষের পক্ষে অনুকূল। বিশেষ করে দোঁয়াশ মাটি এই চাষের পক্ষে ভালো। তবে এঁটেল মাটিতে বেশি পরিমাণে জৈব সার দিয়ে ভালো ফলন পাওয়া যায়। মাটির অল্প অম্লত্ব থাকা দরকার এবং অম্লত্ব ৫.৮-৬.৫-এর মধ্যে থাকলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। পেঁয়াজ কিছুটা লবণাক্ত মাটি সহ্য করতে পারে। অম্লত্ব ৭.০ বা তার বেশি হলে কিছু কিছু অনুখাদ্য, বিশেষত ম্যাঙ্গানিজের অভাব দেখা দেয়। অম্লত্ব ৫.৫-এর নীচে থাকলে চুন প্রয়োগে জমি শোধন করতে হবে। পেঁয়াজ লাগানোর আগে জমিকে ভালোভাবে চাষ দিয়ে সমতল করে জল ও বাতাস চলাচলের উপযোগী করে নেওয়া দরকার।

বীজ বপন ও চারা তৈরি ঃ বীজ বপনের উপযুক্ত সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি থেকে আষাঢ় মাসের শেষ পর্যন্ত বিঘাপ্রতি বীজের হার ৭০০-১০০০ গ্রাম। বীজতলার জন্য প্রথমে এমন একটি জায়গা নির্বাচন করতে হবে যেখানে জলনিকাশি ব্যবস্থা ভালো থাকে। দিনের বেশিরভাগ সময় সূর্যের আলো পায় এবং বিগত ২-৩ বছরে ওই জায়গায় কোনো বীজতলা তৈরী হয়নি। জল না দাঁড়ানো ও নিকাশি ব্যবস্থাযুক্ত উঁচু জমি বীজতলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। বীজতলার মাটি ভালোভাবে কুপিয়ে, পাথর, ইটের টুকরো প্রভৃতি শক্ত জিনিস সমেত আগাছা বেছে নিতে হবে এবং মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। বীজতলার আকার হবে ১০ ফুট x ৩ ফুট x ১ ফুট। এক বিঘা জমি চারা লাগানোর জন্য আনুমানিক এক কাঠা বীজতলার প্রয়োজন হয়। বীজতলার মাটি শোধনের জন্য ট্রাইকোর্ডামা ভিরিডি মেশানো ২ ঝুড়ি পরিমাণ কম্পোস্ট সার ভালোভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করতে হবে। তামাঘটিত ওষুধ যেমন ব্লাইটক্স বা ব্লু কপার (৪-৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে) দিয়ে বীজতলার মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে শোধন করা যেতে পারে। প্রতিটি বীজতলার জন্য ৫০০ গ্রাম অ্যামোনিয়াম সালফেট বা ২২৫ গ্রাম ইউরিয়া ৫০০ গ্রাম সুপার ফসফেট ও ২৫০ গ্রাম মিউরিয়েট অফ পটাশ দিতে হবে। বীজতলা তৈরি হলে ২ ইঞ্চি দুরে লাইন করে ১ অথবা ২ ইঞ্চি গভীরে বীজ বুনতে হবে। বীজ বোনার পর হালকা মাটি বা শুকনো গুঁড়ো জৈব সার দিয়ে বীজ হালকাভাবে চাপা দিতে হবে। এরপর শোধন করা শুকনো খড় বা লম্বা ঘাস দিয়ে বীজতলাকে ঢাকা দিয়ে হালকা করে ঝারি দিয়ে জল দিয়ে বীজতলা ভিজিয়ে দিতে হবে।

বর্ষার প্রকোপ থেকে বীজতলাকে রক্ষা করতে বীজতলার উপর বাঁশের ফ্রেম করে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢাকা জরুরি। বীজতলার দুই-আড়াই ফুট উপরে পলিথিন চাদরের চালা তৈরি করে দিলে বৃষ্টিতে ক্ষতি তো হয়ই না, অধিকন্তু সূর্যের আলো পলিথিনের ভিতর দিয়ে সহজেই পৌঁছতে পারে বলেই চারাগুলি বেশ সতেজ হয়। প্রথমদিকে রোদ পাওয়ার জন্য রোজ সকালে ও বিকালে ২-৩ ঘন্টা করে বীজতলার ঢাকনা খুলে রাখতে হবে। আস্তে আস্তে চারা যত বড় হবে তত বেশি রোদ খাওয়ানো দরকার। বীজতলা রাতে খুলে রাখতে হবে। বৃষ্টি এলে বীজতলা অবশ্যই ঢেকে দিতে হবে। রোদ ও শিশির পেলে চারা শক্ত ও সতেজ হবে। প্রায়োজনের অতিরিক্ত সময় ঢাকা রাখলে চারা অযথা লম্বা হবে এবং রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। বীজতলায় রোগের প্রকোপ কমাতে তামা ঘটিত ওষুধ ২-৩ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। বীজতলায় চারা বেরোতে শুরু করলে বীজতলার উপরের খড় বা ঘাস সরিয়ে দিতে হবে। বীজতলার মাটিতে যেন যথেষ্ট রস থাকে সেইভাবে বীজতলাটিকে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখতে হবে। চারার বয়স এক থেকে দেড় মাসের হলে মূল জমিতে লাগাতে হবে। কম বয়সের চারা লাগালে অনেক চারা মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আবার বেশি দিনের চারা লাগালে, গাছের ভালো বৃদ্ধি না হওয়ার আগে কলি এসে যাবে।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ ঃ খরিফ মরশুমে পেঁয়াজ চাষের জন্য জল দাঁড়ায় না এমন উঁচু জমি নির্বাচন করা প্রয়োজন। জমিটিকে ভালোভাবে চাষ দিয়ে বিঘাপ্রতি ২.৫-৩ টন গোবর সার ও রাসায়নিক সার মিশিয়ে ১.৫ মিটার অন্তর ৫০ সেমি. চওড়া জল নিকাশি নালা করতে হবে। এর ফলে জমিটিতে ১.৫ মিটার চওড়া কয়েকটি ফালি তৈরি হবে। চারা লাগানোর সময় দুটি সারির মধ্যে দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি.) আর সারিতে দুটি গাছের মধ্যে দূরত্ব ৪ ইঞ্চি (১০ সেমি.) রাখতে হবে। এক বিঘা জমির জন্য ৮০,০০০ চারা দরকার।

সার প্রয়োগ ঃ জমি তৈরির সময় বিঘাপ্রতি ২.৫-৩ টন কম্পোস্ট বা গোবর সার ভালোভাবে মিশিয়ে ২-৩ বার চাষ দিতে হবে। লাগানোর সময় মূল সার হিসাবে বিঘাপ্রতি ৮-১০ কেজি নাইট্রোজেন ৮-১০ কেজি ফসফরাস, ৭-৮ কেজি পটাশ ও ৫-৬ কেজি সালফার দিতে হবে।

চাপান সার হিসাবে বিঘাপ্রতি ৮-১০ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৭-৮ কেজি পটাশ দুভাগে চারা লাগানোর ২১-৪৫ দিন পরে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। চাপান সার অবশ্যই চারা লাগানোর দু'মাসের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। পরে দিলে পেঁয়াজের গলা মোটা হয়ে যায়, ফলে কন্দ শুকাতে অনেক সময় লাগে। তাছাড়া কন্দ দুটি ভাগ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনুখাদ্য প্রয়োগে পেঁয়াজের ফলন ও গুণগতমান ভালো হয়। জিঙ্ক সালফেট ২.৫ গ্রাম এবং বোরাক্স ১.৫ গ্রাম হিসাবে প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে ৩০ ও ৬০ দিন পরে স্প্রে করতে হবে।

আগাছা দমন ঃ পেঁয়াজের শিকড় খুব গভীরে যায় না। সে জন্য জমির আগাছা দমনে বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার। বিশেষ করে ফসলের প্রথমের দিকে ভালোভাবে জমিকে আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। হালকাভাবে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে হবে যাতে কন্দের কোনো ক্ষতি না হয়। আগাছানাশক ব্যবহার যতটা সম্ভব ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। চারা লাগানোর আগে এবং ৪৫-৬০ দিন পরে হালকাভাবে নিড়ানি দিয়ে আগাছা তুলে ফেলতে পারলে, জমিতে আগাছার সমস্যা যেমন থাকবে না, তেমন ফলনও বেশি পাওয়া যাবে।

জলসেচ ঃ বর্ষার মরশুমে সেচের খুব একটা দরকার হয় না। বৃষ্টির অভাব হলে মাটিতে যাতে রস থাকে, সেভাবে সেচের ব্যবস্থা রাখতে হবে। ফসল তোলার ১০ দিন আগে কোনো সেচ দেওয়া চলবে না।

ফসল তোলা ঃ শীতকালের পেঁয়াজের মতো বর্ষার পেঁয়াজের পাতা তোলার আগে সম্পূর্ণ হলদে ও শুকিয়ে যায় না। জাত অনুসারে চারা লাগানোর ১১০-১৩০ দিনের মধ্যে ফসল তোলার উপযুক্ত হয়। পাতার কিছু অংশ হলুদ হলে পেঁয়াজ তোলা যেতে পারে। ফসল তোলার ১৫-২০ দিন আগে ১০ শতাংশ সাধারণ লবণ স্প্রে করলে পেঁয়াজের পাতা নেতিয়ে পড়ে অতিরিক্ত জলীয় অংশ বেরিয়ে যায়। এতে পেঁয়াজের কন্দ তাড়াতাড়ি শুকনো হতে সাহায্য করে এবং কন্দের রং উজ্জ্বল হয়। পেঁয়াজের মধ্যে অতিরিক্ত রস কমানোর জন্য গাছ সমেত কন্দগুলিকে ৩-৫ দিন জমিতে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে।

ফলন ঃ জাত অনুসারে বিঘাপ্রতি গড় ফলন ২৫-৩০ কুইন্টাল।।

স্বল্প মূল্যের পেঁয়াজ সংরক্ষন কাঠামো (২৫ টন) তৈরী করুন এবং দেশজ পদ্ধতিতে পেঁয়াজ সংরক্ষন করে অধিক উপার্জ্জন সুনিশ্চিত করুন

সঠিকভাবে দীর্ঘ দিন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করার জন্য কিছু বিষয় খেয়াল করা দরকার, যেমন- পেঁয়াজ কন্দের আকার, জাত প্রকরণ নির্বাচন, চাষ পদ্ধতি, ফসল তোলার সময়, ফসল তোলার পর কন্দের রস মাঠে শুকনো করা (কিওরিঙ), পেঁয়াজের পাতা ছাঁটাই বা শুকনো পাতার ঝুঁটি বেঁধে রাখা, পেঁয়াজ কন্দ শুকনো করা, ঝাড়াই-বাছাই, সংরক্ষণ অবস্থা। আদর্শ পেঁয়াজ সংরক্ষণ এর জন্য আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫% থেকে ৭০% এবং তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হওয়া দরকার।

উন্নত মানের পেঁয়াজ সংরক্ষণ কাঠামো গঠনের প্রধান বিষয় ঃ

১। মাটির আর্দ্রতা বা ভেজা ভাব এবং পেঁয়াজ কন্দে জলের ছোঁয়া এড়াতে উঁচু অবস্থানের জমিতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ কাঠামো তৈরি করা দরকার।

২। একটি প্রকোষ্ঠ এর দৈর্ঘ্য ২০ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট, উচ্চতা ০৯ ফুট। ১৮০০ ঘন ফুট আয়তন এর দুটি (০২) প্রকোষ্ঠ একটি দুই চালের ছাউনির নীচে/তলায় মাটি থেকে ১.৫-২.০ ফুট উঁচুতে করতে হবে। মোট আয়তন ৩৬০০ ঘন ফুট। ভিত ২-৩ ফুট মাটির তলায় রাখতে হবে। মাটির ২.৫-৩.০ ফুট উপর ১৫*১৫ ইঞ্চি থাম এর উপর একটি দুই চালের ছাউনির তলায়/নীচে দুইটি কাঠামো স্থাপন করতে হবে। কাঠামোটির চার দিক লোহার অ্যাঙ্গল, তাল, শাল ইত্যাদি কাঠের খুঁটি দিয়ে করতে হবে।

৩। কাঠামোর ভিতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনের জন্য কাঠামোর ২ ফুট উঁচুতে ফাঁক রেখে অ্যাসব্যাস্টস দিয়ে ঢালু ছাউনির করতে হবে। জলের ছাঁট আটকাবার জন্য ২ ফুট বাড়তি / বেশী বাড়ানো চাল বা ছাউনি রাখতে হবে।

৪। লম্বা দিক পূর্ব-পশ্চিম দিকের সম কোনে করতে হবে। কাঠামোর তলায় জলনিকাশী ব্যবস্থা রাখতে হবে। পেঁয়াজ সংরক্ষণ কাঠামোর ভিতর যথেষ্ট উচ্চতা ও ঢালু থাকা প্রয়োজন, এতে বাতাস অবাধে চলাচল করতে পারবে, কাঠামোর ভিতরে আর্দ্রতাযুক্ত অবস্থা/বা অনু-আবহাওয়া তৈরীর সম্ভবনা থাকবে না।

৫। সংরক্ষিত পেঁয়াজ স্থরের নিচে ও পাশাপাশি দ্রুত ও অবাধে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে পেঁয়াজ সংরক্ষণ কেন্দ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি ও আর্দ্রতা ঠেকানো / নিয়ন্ত্রণ করা যায়। দুটি কাঠামোর চার দিক এবং উপর ও নীচে বাঁশ পাশাপাশি সামান্য ফাঁক রেখে পেরেক মেরে ভরাট করতে হবে। অবাধে ছয় দিক দিয়ে স্বাভাবিক ভাবে বায়ু/বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬। পেঁয়াজ কন্দের রোদ পোড়া (ঝলসানো) রঙ চটা ভাব বা কন্দের মান খারাপ হওয়া দূর করতে সংরক্ষর কাঠামোর উপর সরাসরি রোদ বা বৃষ্টির জল বা জলের ছাঁট পড়া চলবে না।

৭। সংরক্ষিত পেঁয়াজ কন্দের উপর চাপ দেওয়া বা পেঁয়াজ গোছা চাপাচাপি ভাবে রাখা চলবে না। ভিতরে ২ ফুট উঁচুতে ২ ফুট অন্তর ফাঁক রেখে বাঁশের তাক বানাতে হবে এবং সম্পূর্ণ কাঠামোটি রঙ বা আলকাতরা প্রলেপ দিতে হবে।

৮। পেঁয়াজ সংরক্ষণ কাঠামো ও এর চার পাশ জীবানু মুক্ত রাখা প্রয়োজন।

৯। স্থানীয় ভাবে প্রাপ্ত সস্তা, সুলভ ও সহজ লভ্য উপাদান ব্যবহার করে পেঁয়াজ সংরক্ষণ কাঠামো তৈরী করা যাবে।

সরকারী সহায়তা ঃ সর্বাঙ্গীন উদ্যানপালন উন্নয়ন মিশন (MIDH) প্রকল্পের অধীন ২৫ মে.টন সংরক্ষণ ক্ষমতাযুক্ত একটি পেঁয়াজ সংরক্ষণ কাঠামো তৈরীর প্রকল্প মূল্যঃ ১.৭৫ লক্ষ (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা, প্রকল্প মূল্যের ৫০% বা ৮৭ হাজার ৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা বা ভরতুকি (প্রকল্প সঠিকভাবে রূপায়ণের পর) পাওয়া যায়।

কারা আবেদন করতে পারবেন ? যে কোনো ব্যক্তি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ইত্যাদি।

২৫ মে. টন সংরক্ষণ ক্ষমতাযুক্ত পেঁয়াজ সংরক্ষণ কাঠামো তৈরীর প্রযুক্তি ও খরচাদির বিবরণ

১	প্রয়োজনীয় জমির পরিমাপ	৬.৫ মি. x ৭.০ মি.
২	সংরক্ষণ কক্ষের আয়তন	৪.৫ মি x ৬.০ মি.
৩	পছন্দসই প্রযুক্তি	স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম ভাবে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা; তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সে. থেকে ৩০ডিগ্রি সে. এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৫% থেকে ৭০% হওয়া দরকার)।
৪	মাটি থেকে সংরক্ষণ কাঠামোর উচ্চতা	৬০ সে.মি. (দু'ই ফুট)
৫	সংরক্ষণ কাঠামোর ভিতরের উচ্চতা	৯০ - ১৫০ সে.মি. (৩-৫ ফুট)

২৫ মে. টন সংরক্ষণ ক্ষমতাযুক্ত পেঁয়াজ সংরক্ষণ কাঠমো তৈরীর প্রাক্কলন (এস্টিমেট)

ক্রমিক সংখ্যা	বিবরণ	একক	মোট	দর	মূল্য (টাকা)
১	ভিত্ খনন	ঘন মি.	৩.৮৮৮	১৩২	৫১৩.২৬
২	পি.সি.সি. ১:৪:৮ ইঞ্চি ভিত	ঘন মি.	০.৭২৯	৩০০০	২১৮৭.০০
৩	আর. সি. সি. ১:২:৪ স্তম্ভ	ঘন মি.	২.৩৩৯	৩৮৪০	৮৯৮১.৭৬
৪	স্তম্ভের স্বাভাবিক শক্তিবৃদ্ধি	কে.জি	৩২০	৬২.৪০	১৯৯৬৮.০০
৫	লোহার তৈরি কাঠামোর কাজ	কে.জি	১২০০	৭২	৮৬৪০০.০০
৬	অ্যাসব্যাস্টস ছাউনি	বর্গ মি.	৮৩.২	২৪০	১৯৯৬৮.০০
৭	অ্যাসব্যাস্টস এর ঢেউ খেলানো ছাউনি	মি.	১৩	১৪৪	১৮৭২.০০
৮	২"ব্যাস এর ৪/২ বাঁশের ফালা/ফালি @৩"c/c	মি.	১৪৫৪.৪	৩০	৪৩৬৩২.০০
		সর্বমোট			**১৮৩৫২২.০২**
		নিকটবর্তী মূল্যমান			**১,৭৫,০০০.০০**

পেঁপে চাষ

পেঁপে একটি স্বল্প মেয়াদী ফল জাতীয় অর্থকরী ফসল। এটি ফল এবং সব্জি হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
স্বাস্থ্যের জন্য পেঁপের অবদান অপরিসীম

উন্নত জাত ঃ রেডলেডি, হানিডিউ, কুর্গ হানিডিউ, রাঁচি, পুসা ডেলিসিয়াস, পুসা ডোয়ার্ক, কো-১/২, মধু, দুধসাগর, দেবসোনা প্রভৃতি

রোপণের সময় ঃ বর্ষার শুরুতে বা প্রাক্‌বর্ষার হালকা বৃষ্টিতে লাগানো আদর্শ সময়।

রোপণের দুরত্ব ঃ লম্বা-সাধারণত জাত ঃ ২ X ২ মিটার (৬ ফুট X ৬ফুট)
বেঁটে জাতঃ ১.২ X ১.২ মিটার (৪ ফুট X ৪ ফুট)

রোপণের পদ্ধতি ঃ প্রতি বিঘা জমিতে ২ টন গোবর সার, লাঙল ও মই দিয়ে প্রয়োগের পর ১.৫ ঘন ফুট গর্তে ১৫ দিন আগে ১০ কেজি গোবর / কেঁচো সার ২,০০ গ্রাম ইউরিয়া + ৬০০ গ্রাম মিউরিয়েড অব্ পটাশ +৫০ গ্রাম নিমখোল দিয়ে বেঁটে জাতের ১টি, লম্বা জাতের ২টি চারা লাগানো হয়।

সার প্রয়োগ ঃ

প্রয়োগের সময়	জৈবসার	রাসায়নিক সারের মাত্রা ইউরিয়া ফসফট পটাশ
চারা লাগানোর পর থেকে দুই মাস অন্তর, বছরে চারবার। আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্রে গোড়া থেকে এক / দেড় হাত দূরে গোল নালা কেটে।	২.৫ কেজি নিম খইল	১০০ গ্রাম ২০০ গ্রাম ১৫০ গ্রাম দ্বিতীয় বছরে পারলে জৈব সারের সঙ্গে ১ কেজি কেঁচো সার যোগ করুন। সার দেবার সময় অনুখাদ্য মিশ্রন স্প্রে করবেন।

পরিচর্যা ঃ

১) **আগাছা নিয়ন্ত্রণ ঃ** আগাছা বৃদ্ধি পেঁপে সমস্যা আর হাত নিড়ানি দিয়ে প্রথম নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

২) **অন্তবর্তী পরিচর্যা ও জলসেচ ঃ** চারা বসানোর তিন সপ্তাহ পরে গোড়ার হাত খানেক দূর থেকে কুপিয়ে মাটি ধরিয়ে দিন। বর্ষা বাদে শীতে ১০-১৫ দিন ও গরমে ৫-৭ দিন অন্তর মাটি ধরানোর পর নালা কেটে সেচ দিন। বেশি ফল থোকায় ধরলে ছোট ফল তুলে হালকা করে দিতে হবে।

৩) **ফল সংগ্রহ ঃ** জাত অনুসারে ৪-৭ মাসের মধ্যে ফল আসে ও ৮-১০ মাসে পাকা অবস্থায় তোলা হয়। পাকার জন্য রং ধরলে ও জলের মতো তরল হলে পাড়ার উপযুক্ত। কাঁচা ফল চাহিদা, আয়তন দেখে বাজারজাত করুন। পাকা ফল দূরের বাজারে পাঠাতে কিছুটা কাঁচা অবস্থায় তুলে ২ লি. জলে এক চামচ পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণে দু-মিনিট ডুবিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে কাগজে মুড়ে খড় পাঠানো ভালো।

ফলন ঃ দেড় বছর সময়কালে গাছ প্রতি ৫০ কেজি করে বিঘাপ্রতি জমিতে ২০ টন কাঁচা, ১৫ টন পাকা পেঁপে পাওয়া যায়।

রোগপোকা নিয়ন্ত্রণ ঃ

১) **চারাঢলা ঃ** বীজ তলায় চারার গোড়ার জল বসা দাগ, পরে চারা ঝিমিয়ে ঢলে পড়ে ও মারা যায়।
প্রতিকার ঃ বীজ ও বীজতলা / মাটি মিশ্রণ, শোধন। রোগ দেখা গেলে কপার হাইড্রাক্সাইড ২.৫ গ্রাম লিটার প্রতি জলে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

২) **গোড়া / শিকড় পচা ঃ** বর্ষায় বা গোড়ায় জল জমলে মাটির সংযোগস্থলে পচন ধরেও গাছ মরে যায়।
প্রতিকার ঃ পরিচ্ছন্ন চাষের সঙ্গে গোড়ায় মাটি ধরানো, রোগগ্রস্থ জমিতে চুন প্রয়োগ করে জমি তৈরী করতে হবে। আক্রান্ত শিকড় ও সংশ্লিষ্ট মাটিসমেত তুলে পুড়িয়ে / পুঁতে বিনষ্ট করা ও ওই জায়গায় ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো। চারা লাগানোর এক সপ্তাহ পর থেকে কপার অক্সিক্লোরাইড ৪ গ্রাম / কপার হাইড্রোক্সাইড ২.৫ গ্রাম / লি., ৭দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত জামিতে গাছ নষ্ট করে সুস্থ গাছে আগের মতো ছত্রাকনাশক গোড়া ভিজিয়ে স্প্রে করা দরকার।

৩) **পাতা কোঁকড়ানো / মোজাইক ঃ** সাদামাছি ও জাব পোকা বাহিত ভাইরাস রোগে পাতা কুঁকড়ে যায় বা হলুদ সবুজ মোজাইক রোগে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল, ফল ধারণ ক্ষমতা কমে, এবং গাছ মরে যায়।
প্রতিকার ঃ আক্রান্ত গাছ তুলে বিনষ্ট করা। আশপাশে বেগুন, ভেন্ডি ইত্যাদি চাষ না করা। সাদামাছি/ শোষক পোকা দেখলো ইমিডাক্লোপ্রিড ১ মিলি / ৫ লি. জলে, বুপ্রোফেজিন ১ গ্রাম/৫লি. বা অ্যাসিটেমাপ্রিড ২গ্রাম/৩লি. জলে আঠা দিয়ে স্প্রে।

৪) **অ্যানথ্রাকনোজ ও রোদে পোড়া ঃ** ছত্রাক আক্রমণে বা কড়া রোদের দিকে পাতা, ফল বা কান্ড হালকা বাদামি, পরে হলুদ হয়ে পচে যায়। রোদ থেকে ফল বা নরম কান্ড কলাপাতা বা অন্যান্য আচ্ছাদন দিয়ে বাঁচানো ও গোড়া পচা রোগের মতো স্প্রে।

কীটশত্রু ও প্রতিকার ঃ

১) **লাল মাকড় ঃ** অতিক্ষুদ্র লালমাকড় পাতার নিচে রস শোষন করে। পাতা খসখসে জালি হয়ে ফলন পুরো মার খায়। গরম কালে আক্রমণ বাড়ে।
প্রতিকার ঃ ফেনজাক্যুইন বা প্রোপারজাইট ২ মি.লি. বা স্পাইরো মেসিফন ১.৫ মি.লি./লি. জলে গাছ ভিজিয়ে স্প্রে।

২) **মাটির কৃমি / নিমাটোড ঃ** গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে বসে যায়, পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে। ফলন পুরো মার খায়।
প্রতিকার ঃ বীজতলায় প্রতিবর্গমিটারে ২০০ গ্রাম বা পলিপ্যাকের মাটি মিশ্রনে ২০ কেজিতে ১০ গ্রাম কার্বোফুরান প্রয়োগ করতে হবে। রোয়ার আগে কার্বোসালফান ২ মি.লি./লি. শিকড় ভিজিয়ে দিতে হবে। গর্তে নিমখোল ও কার্বোফুরান দিয়ে চারা রোপন করতে হবে।

এক ঝলকে প্যাপেন সংগ্রহ প্রদ্ধতি ঃ

প্যাপেন হল পেঁপের ফলের সাদা আঠা / রস। প্রথম বছরে প্যাপেন বেশি পাওয়া যায়। পরিমাণ বাড়াতে জিব্বারেলিক অ্যাসিড ১০০ পি.পি. এম. স্প্রে কার্যকরি। * ফল ধরার ৭০-৯০ দিনে ৩/৪ ভাগ পুষ্ট পেঁপের বোঁটার দিকের ছালে ২ মি.মি. গভীর স্টিলের ছুরি/বাঁশের চাঁচ দিয়ে চিরতে হবে। * সকাল ৯/১০টার মধ্যে চেরা ৩/৭ দিন বাদে ৪/৬ বার করা যাবে। * চেরা অ্যালুমিনিয়াম/কাঁচের পাত্রে সংগ্রহ। * রস সংগ্রহের পর ফলত্বক ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিন। * রসের সঙ্গে ০.০৫% পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইট। (KMS) মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে মিহি চালুনিতে চেলে পলি প্যাক সংরক্ষণ করা যায়।

বিঃ দ্রঃ - (১) বিশ্বস্ত দোকান থেকে নামী কোম্পানীর বীজ কিনতে হবে। (২) বীজ শোধন, চারা শোধন ও মাটি শোধন ৪ মাস ট্রাইকো র্ডরমা ভিরিডি / রাসায়নিক ১.৫ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম ও ম্যানকোজেবের মিশ্রন দিয়ে করতে হবে। (৩) জমিতে ১০টি স্ত্রী পেঁপে গাছের সাথে অবশ্য পুরুষ গাছ বসাতে হবে।

কাজু বাদামের চাষ

উন্নত জাত ঃ ভেংগুরলা-১, ২-৭ ধনা, এইচ-২/১৬, এইচ-২/১৫, বি.এল.এ. ৩৯-৪। এছাড়া ঝাড়গ্রাম-১ জাতটিও লাগানো যেতে পারে।

জমি নির্বাচন ঃ উঁচু বা মাঝারি জমি ও যথেষ্ট সূর্যালোকযুক্ত জায়গা নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি ও গর্তপূরণ ঃ এপ্রিল-মে মাসে পরিষ্কার করে ৩ ফুট x ৩ ফুট x ৩ ফুট গর্ত খুঁড়ে প্রয়োজনে মাস খানেক সূর্যালোক খাওয়ানো দরকার। পরে উপরের মাটির সাথে ৫ কেজি গোবর সার, ২০০ গ্রাম সুঃ ফসফেট ও ৫০-৬০ গ্রাম ফিউরাডান ৩ জি ভালোভাবে মিশিয়ে সামান্য উঁচু করে গর্ত ভরাট করা হয়।

দূরত্ব ঃ সাধারণত ৬মি. দূরত্বে (২৭৮ টি চারা প্রতি হেক্টরে) চারা লাগানো হয়, তবে বর্তমানে কেউ কেউ ঘন করে (৫মি. x ৫মি. - ৪০০টি প্রতি হেক্টর; ৪মি x ৪মি.-৬২৫ টি প্রতি হেক্টরে) গাছ লাগাচ্ছেন। এতে প্রথম দিকে প্রতি একরে বেশি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব, তবে ৫-১১ বছরের মধ্যে একটি গাছের বেড় অপরটিকে ছুঁলে ২৫-৪০ শতাংশ পর্যন্ত গাছ কেটে হালকা করে দিতে হবে।

চারা রোপণ ও লাঠি বাঁধা ঃ জুলাই-আগষ্ট মাসে কলমের চারা ভরাট গর্তের মাঝের মাটি সরিয়ে ভালোভাবে বসানো হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে জোড় কলমের সংযোগস্থল মাটির থেকে অন্তত ১০ সেমি উপর থেকে ও গোড়ার মাটি একটু উঁচু করা থাকে যা গাছের গোড়ায় বর্ষার জল জমতে দেয় না। চারা বসানোর পর অবশ্যই কাটির সাথে চারাটি একটু বেঁধে দেওয়া হয় যাতে ঝড়ে ক্ষতি না হয়। বেশ কিছুদিন পরে জোড় কলমের সংযোগস্থলের পলিথিন ফিতাটি সাবধানে খুলে ফেলতে হবে।

আচ্ছাদন ঃ চারা বসানোর পর গোড়ার চারদিকে শুকনো পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় যা মাটির রস বজায় রাখে, মাটি ধুয়ে যাওয়া বন্ধ করে, গোড়া আগাছামুক্ত রাখে, সর্বোপরি ওই পাতা পচে মাটিতে জৈব সারের জোগান দেয়।

সার প্রয়োগ ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বছর গাছের গোড়া থেকে ৭৫ সেমি দূরে ও তৃতীয় বছর থেকে ১৫০ সেমি দূরে ২৫ সেমি চওড়া গর্তে ১৫ সেমি গভীরে সার দেওয়া হয়। সমস্ত জৈব সার বর্ষার আগে রাসায়নিক সারের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

বয়স/বর্ষ	গোবর /জৈব সার (কেজি)	গ্রাম গ্রাছ প্রতি					
		বর্ষার আগে			বর্ষার পরে		
		ইউরিয়া	সিঃসুঃফঃ	মিঃ অঃ পটাশ	ইউরিয়া	সিঃসুঃফঃ	মিঃ অঃ পটাশ
প্রথম	-	-	-	-	১০০	৬০	৬৫
দ্বিতীয়	১০	১৩৫	১০০	৩৫	১৬৫	১০০	৬৫
তৃতীয়	১৫	৩৩০	২০০	৭০	৩৩০	২০০	৭০
চতুর্থ ও ঊর্ধ্বে	১৫	৫৫০	৩২২	১০৪	৫৫০	৩২২	১০৪

সেচ ঃ বাগানের প্রথম ২-৩ বছর জানুয়ারি থেকে বর্ষা আসা পর্যন্ত ১৫-২০ দিন অন্তর জলসেচ দেওয়া উচিত।

বর্ষার জল সংরক্ষণ ঃ গাছের বেড়ের চারদিকে গোলাকার, অর্ধগোলাকার বা লম্বা নালা অথবা ঢালু জমিতে ৪টি গাছের মাঝখানে একটি করে নালা বা গর্ত খুঁড়ে বর্ষার জল সংরক্ষণ করা হয়। বৃষ্টি নির্ভরশীল অঞ্চলে এই পদ্ধতি খুবই উপযোগী, বিশেষ করে যেখানে বৃষ্টিপাত খুব কম সময়ের জন্য হয় ও মাটির জল ধারণ ক্ষমতা কম।

মাধ্যমিক পরিচর্যা ঃ

১) কলমের সংযোগস্থলের নীচ থেকে বের হওয়া সব ডাল ছেঁটে দিতে হবে।

২) প্রধান কাণ্ডে গোড়া থেকে প্রায় ১ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত যেন কোনো ডালপালা না থাকে।

৩) গাছের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য ছাঁটাই এমনভাবে করা উচিত যেন চারদিকে ৪-৫টি ডাল ছড়িয়ে থাকে। যে সমস্ত ডাল ক্রমশ্য

নিচু হয়ে মাটিতে লাগছে সে সমস্ত ডাল একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে ছেঁটে দিতে হবে।

৪) রোগাক্রান্ত দূর্বল ও শুকনো ডাল কেটে দিতে হবে, এর ফলে ডগা শুকনো রোগের সম্ভাবনা কমে যায়।

৫) চারা লাগানোর প্রথম ২ বছর মুকুল ছেঁটে দিতে হবে।

আগাছা দমন ঃ চারা লাগানোর প্রথম ২-৩ বছর গাছের গোড়ার চারদিকে কোদাল দিয়ে আগাছামুক্ত রাখা হয়। এছাড়া পাওয়ার টিলার হালকা ভাবে চালিয়ে বাগানকে আগাছামুক্ত করা যায়।

ফলন ও ফসল সংগ্রহ ঃ তৃতীয় বছর থেকেই ফল ধরতে শুরু করে ও ৩০ বছর পর্যন্ত পর্যাপ্ত ফল দেয়। ১০ বছর বয়সের গাছ থেকে গড়ে প্রায় ১৫ কেজি ফলন পাওয়া যায়। কাজুর ফুল বাদামে পরিণত হওয়ার সময় বোঁটা ফেঁপে ওঠে ও ক্রমে ফলের আকার ধারণ করে। একে বলা হয় কাজু আপেল। আপেল উজ্জ্বল লাল রংয়ের ও রসালো হয়, তখন গাছ থেকে পেড়ে নিতে হবে। এই সময় বাদামের খোসা বাদামি রঙের হতে থাকে। কাজু ও আপেল পৃথক করা হয়। মেঝের উপর কাজুগুলিকে ২-৩ দিন রৌদ্রে ভালো করে শুকিয়ে বস্তায় ভরা হয়।

রোগপোকা ও তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঃ

পোকা ঃ

চায়ের মশা ঃ অক্টোবর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এরা সক্রিয় থাকে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় দেখা যায়। এদের আক্রমণে ফুল, পাতা ফল, কাণ্ড প্রভৃতি শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। প্রায় ৩০ শতাংশ ফলন নষ্ট হয়।

প্রতিকার ঃ

১) মনোক্রোটোফস (৩৬ ইসি) ১.৫ মি.লি. প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে, নতুন পাতা আসার সময় অক্টোবর মাস।

২) এন্ডোসালফন (৩৫ ইসি) ১.৫ মি.লি. প্রতিলিটার জলে গুলে স্প্রে-মুকুল আসার সময় (ডিসেম্বর মাস)।

৩) কার্বারিল (৫০ শতাংশ) ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্র, ফল আসার সময় (ফ্রেব্রুয়ারি মাস)।

কাণ্ড ও শিকড় ছিদ্রকারী পোকা ঃ সাধারণত ১০-১২ বছরের বেশি বয়সের গাছ এই পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। গাছের গোড়ার ছাল থেকে আঠা ও কাঠের গুড়ো বের হতে থাকে, পাতা হলদেটে হয়ে যায় ও অবশেষে আক্রান্ত গাছ মারা যায়। প্রায় ১০ শতাংশ ফসল নষ্ট হয়।

প্রতিকার ঃ পোকার গর্তে শিক ঢুকিয়ে শূককীট মেরে ফেলতে হবে। গর্তে মনোক্রোটোফস জাতীয় ওষুধ ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে দিয়ে গর্ত বন্ধ করে দিতে হবে। এছাড়া নভেম্বর ও এপ্রিল মাসে গাছের গোড়ায় চারদিকে ১ মিঃ দূরত্ব পর্যন্ত ৭০ গ্রাম কার্বারিল ৪জি অথবা ৫০ গ্রাম ফোরেট ১০জি মাটি কুপিয়ে মিশিয়ে দিতে হবে এবং নিমতেল (৫ শতাংশ) ও ০.৫ মিঃ লিঃ টিপল প্রতি লিটার জলে গুলে গাছের প্রধান কাণ্ডে গোড়ার দিকে থেকে ১ মিটার পর্যন্ত ভালোভাবে মাখিয়ে দিতে হবে।

পাতা সুড়ঙ্গীকারী পোকা ঃ অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাস পর্যন্ত দেখা যায়। এরা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কম হয়।

প্রতিকার ঃ মালাথিয়ন প্রতি লিটার জলে ৩ মিলি হারে গুলে পাতা ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

উইপোকা ঃ লাল ও কাঁকুরে মাটি অঞ্চলে এদের উপদ্রবে গাছের শিকড় ও কাণ্ড ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রতিকার ঃ ক্লোরোপাইরিফস ৫-১০ মিলিঃ প্রতি লিটার জলে গুলে গাছের গোড়ার চারদিকে মাটি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

পাতা ও মুকুল জড়ানো পোকা ঃ নতুন পাতা আসার সঙ্গে সঙ্গে এদের আক্রমণ শুরু হয়। অনেকগুলি পাতা ও মুকুল একসঙ্গে জড়িয়ে পাতা ও মুকুলের ক্ষতি হয়।

প্রতিকার ঃ চা-মশার দমন পদ্ধতির অনুরূপ।

খ) রোগ ঃ

ধ্বসারোগ ঃ এই রোগের আক্রমণে ১ বছরের ছোট গাছ মারা যায়। গাছের গোড়ায় যাতে জল যাতে না জমা হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রতিকার ঃ কপার অক্সি-ক্লোরাইড ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ডাইব্যাক ঃ গাছের ডাল উপর থেকে নীচের দিকে ক্রমশঃ শুকিয়ে যেতে থাকে।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত অংশটি কেটে ফেলা ও কাটা জায়গায় বোর্দো মিশ্রণের লেই-এর প্রলেপ দেওয়া, মে ও ডিসেম্বর মাসে এক শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ স্প্রে করতে হবে।

গামোসিস ঃ এই রোগের আক্রমণে গাছের ছাল কেটে আঠা বের হয়। পরে ওই অংশে পচন শুরু হয়।

প্রতিকার ঃ ক্ষত অংশটি ধারালো ছুরি দিয়ে চেঁচে ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে ও ওই অংশে বোর্দো মিশ্রণের লেই ভালোভাবে লাগাতে হবে।

নারকেল চাষ

নারকেল একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। খাদ্য, আবাসন, আসবাব এবং বিভিন্ন শিল্পোপযোগী সামগ্রী প্রদানকারী গাছের প্রতিটি অংশ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় বলে নারকেল গাছকে কল্পবৃক্ষ বলা হয়। আমাদের রাজ্যে বাণিজ্যিকভাবে নারকেল চাষ করা লাভজনক।

মাটি ঃ প্রায় সব ধরনের মাটিতে নারকেল চাষ করা যায়, তবে দোঁ আঁশ মাটি এই ফসল চাষের উপযুক্ত।

জাত প্রকরণ ঃ গাছের উচ্চতার উপর ভিত্তি করে নারকেলের জাতকে সাধারণত দু-ভাগে করা যায়—

১) **লম্বা জাত ঃ** গাছ ৫-২০ মিটার লম্বা, ফল আসতে ৭-৮ বছর সময় লাগে, ৮০-৯০ বছর বেঁচে থাকে।

২) **বেঁটে জাত ঃ** গাছ ৮-১০ মিটার লম্বা, ফল আসতে ৪-৫ বছর সময় লাগে, ৫-৬০ বছর বেঁচে থাকে।

এছাড়া হাইব্রিড জাতের নারকেলও চাষ করা হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য সুপারিশকৃতজাত ঃ

লম্বাজাতীয় ঃ নারকেল যেমন কল্পমিত্র, কল্যাণী নারকেল, পূর্ব উপকূলীয় লম্বা (ইস্ট কোস্ট টল) দেশি লম্বা, হাজারি ইত্যাদি।

বেঁটে জাত ঃ কেরালা বেঁটে, হলুদ বেঁটে, মালায়ালাম হলুদ বেঁটে।

হাইব্রিড জাত ঃ চন্দ্রকল্প, কেরাচন্দ্র, কেরাশঙ্কর ইত্যাদি চাষ করা যায়।

বংশবিস্তার এবং বীজ সংগ্রহ ঃ নারকেলের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা হয়। সাধারণত ২৫-৩০ বছর বয়স্ক উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত বছরে গাছপ্রতি গড়ে ৮০টি ফল দেয়, সুস্থ সবল নীরোগ এবং কমপক্ষে ৩৫টি সবুজ পাতাযুক্ত 'মা-গাছ' থেকে বীজ সংগ্রহ করা উচিত। মা-গাছের মাথা দেখতে অর্ধচন্দ্রাকৃতি থেকে গোলাকার হওয়া দরকার। বীজ হিসাবে ব্যবহারের জন্য কেবলমাত্র ফেব্রুয়ারী-মে (মাঘ-বৈশাখ) মাসে উৎপাদিত ১১-১২ মাস বয়সের এবং ১২০০ গ্রাম গড় ওজনের ফল বীজ হিসাবে বাছাই করতে হয়। বীজের জন্য ফল দড়ির সাহায্যে সাবধানে সংগ্রহ করা হয়।

চারা নির্বাচন ঃ রোপণের জন্য চারা বাছাই করতে হলে সতেজ, নীরোগ, চওড়া গোড়াযুক্ত-লম্বা জাতের ক্ষেত্রে গোড়ার পরিধি (বেড়) ১০ সে.মি. (৪ইঞ্চি) এবং বেঁটে বা হাইব্রিড জাতের বেলায় ১২ সে.মি. (৪.৫-৫ ইঞ্চি) হওয়া প্রয়োজন। চারাতে কমপক্ষে ৬-৮টি পাতা থাকা দরকার, এর মধ্যে দু-তিনটি পাতা সম্পূর্ণ খুলে থাকবে।

জমি তৈরি ঃ খোলামেলা সারাদিন রোদ থাকে (বছরে ২০০০ ঘন্টা সূর্যালোক প্রয়োজন), উঁচু অবস্থানের জল নিকাশের ব্যবস্থাযুক্ত জমি চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। চারা রোপণের অন্তত একমাস আগে সাধারণত বর্গাকার পদ্ধতিতে অর্থাৎ সারি থেকে সারি এবং গাছ থেকে গাছ সমান বা একই দুরত্ব রেখে গর্ত খোঁড়া হয়। গাছ থেকে গাছ ও সারি থেকে সারি ৭.৫-৮ মিটার (২৪-২৫ ফুট) দূরত্বে গাছ রোপণ করা উচিত। এভাবে এক একর জমিতে ৬০-৭০টি গাছ লাগানো হয়। কম দূরত্বে চারা রোপণ করলে গাছ বেঁকে যায় ও পরবর্তীকালে অনেক সমস্যা দেখা দেয়।

গর্ত তৈরী ঃ রোপণের এক মাস আগে ১ মি. দৈর্ঘ্য, ১ মি. চওড়া, ১মি. গভীর মাপের গর্ত করতে হবে। গর্ত তৈরির সময় উপরের অর্ধেক মাটি গর্তের একদিকে এবং নীচের অর্ধেক মাটি অন্যদিকে রাখতে হবে। দু-সপ্তাহ রোদ খাওয়ানোর পরে গর্তের উপরের মাটির সাথে ২০ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম নিম খইল, ২৫০ গ্রাম হাড়গুঁড়ো এবং ২৫ গ্রাম সোহাগা মিশিয়ে গর্তের নীচের অংশ এবং নীচের মাটি দিয়ে গর্তের উপরের অংশ ভরাট করতে হবে।

চারা রোপণ পদ্ধতি ঃ বর্ষাকাল চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। বিকাল বেলায় সার ও মাটি মেশানো গর্তের ঠিক মাঝখানে চারা রোপণ করা হয়। চারার গোড়া গর্তের ১৫-২০ সে.মি. গভীরে রাখা হয়। নতুন লাগানো চারার জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এজন্য অড়হড় বা ধৈঞ্চাবীজ চারার চারিদিকে ৫০ সে.মি. (দেড় ফুট) দূরত্বে বুনে জীবন্ত বেড়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ ঃ ভালো ফলন পেতে হ'লে বছরে দু-বার সার প্রয়োগ করা উচিত। রোপণের পর মোট সারকে দু'ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ বর্ষার শুরুতে (মে-জুন) এবং দ্বিতীয় ভাগ বর্ষার পরে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) সারণি অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

বয়স অনুযায়ী নারকেল গাছে বাৎসরিক সার প্রয়োগ

গাছের বয়স	খামার সার (কেজি)	নিম খইল (গ্রাম)	ইউরিয়া (গ্রাম)	সিঙ্গল সুপার ফসফেট (গ্রাম)	মিউরিয়েটর অব পটাশ (গ্রাম)	সোহাগা (গ্রাম)
প্রথম বছর*	৫	২৫০	১০০	২০০	২০০	-
দ্বিতীয় বছর	১০	৪০০	২০০	৪০০	৪০০	২৫
তৃতীয় বছর	১৫	৬০০	৪০০	৬০০	৬০০	২৫
চতুর্থ বছর	২০	১০০০	৬০০	৮০০	৮০০	৫০
পঞ্চম বছর	২৫	২০০০	৮০০	১০০০	১০০০	৫০
ষষ্ঠ থেকে নবম	৩০	৩০০০	১০০০	১৫০০	১৫০০	৬০
দশম বছর	৪০	৫০০০	১২০০	২০০০	২০০০	১০০

*** শুধুমাত্র অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে।**

বয়স অনুযায়ী গাছের চারপাশে গোড়া থেকে ১-২ মিটার (৩-৬ ফুট) দূরত্বে সার প্রয়োগের জন্য ৩০ সে.মি. (এক ফুট) গভীরতায় ৪৫ সে.মি. (দেড় ফুট) চওড়া গোলাকার নালা তৈরি করা হয়। গর্ত খোঁড়ার সময় গাছকে ডাইনে ও বাঁয়ে রেখে যত দূর সম্ভব শিকড় না কেটে সাবধানে কোদাল চালাতে হয়। বয়স অনুযায়ী সুপারিশকৃত সার একত্রে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। এরপর প্রয়োজন হলে হালকা সেচ দিতে হয়। শুধুমাত্র রাসায়নিক সারের উপর নির্ভর না করে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ৮-১০ দিন পর জীবাণু সার প্রয়োগ করা লাভজনক। মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

সাথী ফসলের চাষ ঃ সাধারণত রোপণের এক থেকে আট বছর এবং ২৫ বছরের পর থেকে নারকেল গাছের বাগানে সাথী ফসল চাষ করা যায়, কারণ এই সময়ে সাথী ফসল চাষের জন্য উপযুক্ত সূর্যালোক পাওয়া যায়। নারকেল বাগানের অন্তর্বর্তী জায়গায় সাথী ফসল হিসাবে আদা, হলুদ, গোলমরিচ, বিভিন্ন সবজি, স্বল্পমেয়াদি ফল, ওষধি ইত্যাদি ফসল চাষ করা যায়।

পরিচর্যা ঃ গ্রীষ্মকালে পরিমাণমতো সেচ দেওয়া প্রয়োজন। অনুসেচ ব্যবস্থাপনায় বিন্দু বিন্দু পদ্ধতিতে সেচ প্রদান অধিক লাভজনক। আচ্ছাদন দিয়ে গাছের গোড়ার আগাছা নিয়ন্ত্রন করা দরকার। কচুরিপানা বা শুকনো পাতা আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করা লাভজনক। অন্যথায় গাছের গোড়ার চারদিকে এক মিটার দূরত্বে লজ্জাবতী চাষ করা যায়।

গাছের কাঁচা পাতা অযথা কাটা চলবে না। শুধুমাত্র শুকনো পাতা, শুকনো কাঁদি কাটা যেতে পারে। রোপণের প্রথম দু'বছর প্রতিটি গাছকে ছায়া প্রদান এবং সুরক্ষিত রাখতে বেড়া দেওয়া আবশ্যক।

ফসল তোল ও ফলন ঃ নারকেল হিসাবে ব্যবহারের জন্য ১১-১২ মাস বয়সের পরিণত হালকা সবুজ বাদামি রঙের ফল তোলা হয়। ডাব হিসাবে ব্যবহারের জন্য ৫-৬ মাস বয়সের ফল তোলা হয়। একটি উন্নত লম্বা জাতের গাছ থেকে গড়ে ৮০-১০০টি ফল এবং একটি হাইব্রিড জাতের গাছ থেকে গড়ে ১২০-১৪০টি ফল পাওয়া যায়।

রোগপোকা ও শস্যরক্ষা পদ্ধতি ঃ

রোগ ঃ

ডগা পচা বা কুঁড়ি পচা ঃ গাছের ডগার দিকে এক-দুটি পাতা প্রথমে ধূসর বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি, পরে হালকা বাদামি হয়ে ঝিমিয়ে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। অনেক সময় গোড়ার দিকের নরম অংশ পচে যায়, পাতা ভেঙে যায়। আক্রান্ত অংশ থেকে দুর্গন্ধ আঠালো রস বের হয়। অতিরিক্ত আর্দ্র আবহাওয়াতে ছত্রাকজনিত এই রোগের প্রকোপ বাড়ে।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

১। আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার করে ১০% বোর্দো লেই বা ব্লাইটক্স লেই প্রলেপ দিয়ে পলিথিন ঢাকা দিতে হবে।

২। আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার করার পর ফেলে দেওয়া গাছের পচা অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফল ঝরা বা মাহালি রোগ ঃ ছত্রাকঘটিত এই রোগে আক্রান্ত হলে ছোটো-বড় সব ধরনের ফল পচে ঝরে যায়। বর্ষার আগেও পরে এই রোগ বেশি হয়। আক্রান্ত ফলের মুখের দিকে ঘন বাদামি রঙের ছোটো ছোটো গর্ত হয় এবং ছালের উপর তুলোর মতো ছত্রাক দেখা যায়। কচি ফল পচে যায় ও পরিণত ফলের শাঁস পচে যায়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

১। ঝরে যাওয়া ফলগুলি সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

২। বর্ষার আগে ও পরে কাঁদিতে ০.৫% কপার অক্সি-ক্লোরাইড অথবা ১০% রসুন নির্যাস বা ০.৫% বোর্দো মিশ্রণ বা ০.১% কার্বেন্ডাজিম স্প্রে করতে হবে।

৩। শিকড়ের সাহায্যে ছত্রাকনাশক ট্রাইডেমর্ফ (ক্যালিক্সিন)-এর ৫ শতাংশ জলীয় দ্রবণ (৫ মি.লি. প্রতি ১০০ মি.লি. জলে) খাওয়াতে হবে।

থাঞ্জাভুর উইল্ট বা পাতা ঝিমানো রোগ ঃ ছত্রাকঘটিত (গ্যানোডার্মা) রোগে আক্রান্ত গাছের পাতা প্রথমে হলদে ও পরে বাদামি হয়ে শুকাতে শুরু করে। পরে পাতা ভেঙে যায়। অবলম্বন না পেয়ে ফলসহ কাঁদি ঝরে যায়। কাণ্ডের গোড়ায় ক্ষত হয়ে রস গড়ায় এবং শেষে গাছ মরে যায়। বাগান রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এই রোগ বেশি হয়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

১। বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

২। সুপারিশকৃত সার ছাড়াও গাছপ্রতি ৫ কেজি নিম খইল ও জীবাণু সার দিতে হবে।

৩। শিকড়ের সাহায্যে ছত্রাকনাশক ট্রাইডেমর্ফ (ক্যালিক্সিন)-এর ৫ শতাংশ জলীয় দ্রবণ (৫ মি.লি. প্রতি ১০০ মি.লি. জলে) খাওয়াতে হবে।

এই পদ্ধতিতে গাছের গোড়া থেকে এক মিটার (তিন ফুট) দূরত্বে নতুন বাড়ন্ত শিকড়ের ডগা অথবা অল্প পরিণত শিকড়ের ডগা আলতো করে তেরছাভাবে কেটে ডগার প্রান্ত উপরোক্ত ছত্রাকনাশকের জলীয় দ্রবণ ভরা পলিথিন প্যাকেটের তলা পর্যন্ত ঢুকিয়ে হালকা করে বেঁধে রাখতে হবেব। আক্রান্ত গাছের চার দিকে শিকড়ের সাহায্যে ১৫ দিন অন্তর তিন বার এই ছত্রাকনাশক খাওয়াতে হয়। সাধারণ নারকেল গাছেও বছরে তিনবার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কাজ হয়ে গেলে এই পলিথিন প্যাকেট তুলে ফেলে দিতে হবে।

এই পদ্ধতিতে কীটনাশক ও অনুখাদ্য নারকেল গাছে প্রয়োগ করা যায়। এছাড়া

৪। আক্রান্ত কাণ্ডের ক্ষত পরিষ্কার করে কপার অক্সি-ক্লোরাইড-এর লেই (১০০গ্রাম/লিটার জলে) দিয়ে প্রলেপ দিতে হবে। প্রতি বছর বর্ষার শেষে গাছের গোড়া এক শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ অথবা ০.৫ শতাংশ কপার অক্সি-ক্লোরাইড-এর জলীয় দ্রবণে ভিজিয়ে দিতে হবে।

৫। গাছের গোড়ায় বেশি খোঁড়াখুঁড়ি করা বা জল জমতে দেওয়া উচিত নয়।

৬। এই রোগ বাগানের অন্য গাছে ছড়ানো বন্ধ করতে এক মিটার গভীর ও ৩০ সে.মি. চওড়া গর্ত আক্রান্ত গাছের দুই মিটার দূরে চারপাশে খুঁড়ে রাখতে হবে।

৭। সাথী ফসল হিসাবে কলা চাষ করতে হবে।

কাণ্ড ও গুঁড়ির রস ঝরা ঃ ছত্রাকঘটিত এই রোগে আক্রান্ত হলে গাছের কাণ্ড লম্বাভাবে ফেটে যায়। ফাটা অংশ দিয়ে লালচে বাদামি রস গড়াতে থাকে। এই রস শুকিয়ে কালো রঙের হয়। আক্রান্ত অংশ পচতে শুরু করে। পরে এটি ছড়িয়ে পড়ে, কাণ্ডের গায়ে গর্ত তৈরি হয়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

১। আক্রান্ত স্থান ছুরি দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ১০% বোর্দো লেই দিয়ে লেপে দিতে হবে। ক্ষতস্থান বড় হলে শুকিয়ে যাওয়া বোর্দো লেই-এর উপর আলকাতরা বা সিমেন্টের প্রলেপ দেওয়া যেতে পারে।

২। শিকড়ের সাহায্যে ট্রাইডেমর্ফ ৫ শতাংশ জলীয় দ্রবণ (৫মি.লি. প্রতি ১০০ মি.লি. জলে) খাওয়াতে হবে।

৩। সুপারিশ করা নিমখইলের সাথে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

কীটশত্রু ঃ

গণ্ডারে পোকা ঃ এই পোকা গাছের ডগার নরম অংশ গর্ত করে নালি তৈরি করে। পোকার কীড়া নালির মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এরা কচিপাতা ও ফুল চিবিয়ে খায়। নতুন পাতা কাটা কাটা দেখায়। বেশি আক্রমণে ছোট গাছ মরে যায়।

নিয়ন্ত্রণ প্রদ্ধতি ঃ

১। গাছের কাঁচা পাতা কাটা উচিত নয়। বর্ষার আগে গাছের মাথা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। খুব প্রয়োজন হলে ১.২ মিটার (৪ ফুট) পাতার গোড়া রেখে কাটা যেতে পারে।

২। গাছের কাণ্ডে কোনো ক্ষত হলে পরিষ্কার করে বোর্দো লেই দিয়ে পূরণ করে অথবা বড় ক্ষত হলে সেখানে সিমেন্ট বা বালি দিয়ে প্লাস্টার করে দিতে হবে।

৩। এছাড়া 'ফেরুজিনেওল' ফেরোমোন ফাঁদ ব্যবহার উপযোগী।

ইরিওফাইড মাকড় ঃ এই মাকড় বর্তমানে নারকেল চাষের একটি মারাত্মক সমস্যা। মাকড়ের আক্রামণে ১০-৮০ শতাংশ পর্যন্ত উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এরা দলবদ্ধভাবে বোঁটার নীচে সবুজ কচি অংশের রস চুষে খায়। আক্রমণের প্রথমে কচি ডাবের বোঁটার নীচে ত্রিকোণ আকারের সাদা দাগ দেখা যায়। এই দাগ পরে তামাটে হয়। বাড়ন্ত ডাবের উপর লম্বা লম্বা তামাটে বা বাদামি ফাটল দেখা যায়। ফাটল থেকে অনেক সময় আঠালো রস বের হয়। ডাব ছোটো অবস্থায় গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ইঁদুর, বিভিন্ন কীটপতঙ্গ এবং বাতাসের মাধ্যমে মাকড়ের সক্রমণ ঘটে। মাকড়ের আক্রমণের ফলের আকার বিকৃত হয়ে যায় এবং ভিতরের শাঁসের পরিমাণ ও ফলের মান কমে যায়। বাজারে সঠিক দাম পাওয়া যায় না।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

(১) সুপারিশ অনুযায়ী জৈব এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। (২)নারকেলের বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

(৩) শিকড়ের সাহায্যে কীটনাশক খাওয়ানো পদ্ধতিতে ১০ মি.লি. এক শতাংশ (১০০০০ নিযুতাংশ) নিমতেল + ১০ মি.লি. জল অথবা ১৫ মি.লি. কার্বসালফান / ট্রায়াজোফস্ +১৫ মি.লি. জলের মিশ্রণ বছরে তিনবার (বীষ্ম-বর্ষার পর-শীতকাল) প্রয়োগ করতে হবে।

কালো মাথা লেদা পোকা ঃ গোলাপি বর্ণের কালো মাথা লেদা পোকা পাতার নীচে রেশমি জাল বানিয়ে থাকে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। পাতা বাদামি হয়ে শুকিয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

১। আক্রান্ত পাতা পুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে। (২) ১০ মি.লি. মোনোক্রোটোফস এবং ১০ মি.লি. জল একত্রে মিশিয়ে আগে বলা পদ্ধতি অনুযায়ী শিকড়ের সাহায্যে গাছের ৪-৫ দিক দিয়ে গাছকে খাওয়াতে হবে।

ইঁদুর ঃ এরা কচি ও নরম ফল কেটে নষ্ট করে। অন্যান্য রোগ ছড়ায়। গাছ কাছাকাছি থাকলে এই সমস্যা বেশি হয়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ

(১) সঠিক দূরত্বে গাছ রোপণ করা দরকার। (২) গাছের মাথা পরিষ্কার করতে হবে।

৩। ইঁদুরের গাছে ওঠা বন্ধ করতে মাটি থেকে এক-দুই মিটার (৩-৬ ফুট) উঁচুতে গাছে কাণ্ডের চারদিকে টিনের পাত দিয়ে টোপরের মতো ঘিরে দিতে হবে।

শারীরবৃত্তীয় উপসর্গ ঃ পরিচর্যা এবং পুষ্টির অভাবে নারকেল গাছে ভূয়ো বা ফোঁপড়া নারকেল, ফল ঝরা, সরু সুঁচালো ডগা নতুন পাতা বের না হওয়া ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় উপসর্গ দেখা যায়।

নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ঃ নিয়মিতভাবে সুপারিশ মাত্রায় পটাশঘটিত সার এবং অনুখাদ্য যেমন বোরন, দস্তা ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হবে।

বোর্দো মিশ্রণ প্রস্তুতি ঃ বোর্দো মিশ্রণ তৈরি অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায় না। ব্যবহারের আগে এই মিশ্রণ বাড়িতে তৈরি করে নিতে হয়। এক শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ তৈরির জন্য পাঁচ লিটার জলে ১২০ গ্রাম কলিচুন এবং পাঁচ লিটার জলে ১০০ গ্রাম তুঁতে আলাদাভাবে মাটির বা প্লাস্টিকের পাত্রে রাতে ভেজানো হয়। পরদিন ওই চুন ও তুঁতে বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, ফেলে রাখা চলবে না।

বোর্দো লেই তৈরি ঃ দুটি পৃথক অধাতব (মাটি ও প্লাস্টিকের) পাত্রে ৫০০ মি.লি. জলে ১০০ গ্রাম তুঁতে এবং ১০০ গ্রাম চুন আলাদা করে কাঠ বা প্লাস্টিকের কাঠি দিয়ে গুলে নিয়ে তৃতীয় আরেকটি অধাতব পাত্রে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এই মিশ্রণ থেকে এক কেজি পরিমাণের বোর্দো লেই পাওয়া যায়।

ছায়াজালের ঘরে ফসল চাষ

পৃথিবীর জনসংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, অথচ চাহিদা মতো চাষের উপযোগী এলাকা আর বাড়ানো সম্ভব নয়। কম চাষের এলাকা থেকে বেশী উৎপাদন কেবলমাত্র উদ্যানজাত ফসল চাষের মাধ্যমে করা সম্ভব। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে কম জায়গায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পলিহাউস করতে পারলে তো ভালো, না হলে ও ছায়াজাল বা সেডনেট দ্বারা নির্মিত ঘরের অর্থকরী ফসল যেমন- উচ্চমূল্য ও উৎকৃষ্ট গুনমানযুক্ত ফুল বা সবজির চারা উৎপাদন ও চাষ (ফসল উৎপাদন) করে অধিক ফলন নিয়ে অতিরিক্ত আয় করা সম্ভব। ছায়াজালের ঘর তৈরী করার জন্য সরকারী আর্থিক অনুদান পাওয়া যায়।

ছায়াজাল বা সেডনেট হল প্লাসটিক (পলিইথিলিন বা পলিপ্রোপিলিন) দ্বারা নির্মিত হালকা, নমনীয় চাদর যা দিয়ে প্রয়োজনীয় জল ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে এবং আলো আংশিকভাবে নির্দিষ্ট পরিমানে আটকায়। এটি বিভিন্ন রঙের (নীল, সবুজ, লাল, কালো, সাদা ও এইসব রঙের মিশ্রণ) হয়। এর ছায়া প্রদান করার ক্ষমতা বিভিন্ন রকম ৩৫%,৫০%,৭৫% ইত্যাদি। যেমন ৫০% শেডনেট শুধুমাত্র ৫০% সূর্যের আলো প্রবেশ করতে দেবে এবং বাকীটা আটকাবে। এই নেট যথেষ্ট শক্ত, সহজে ছিঁড়ে যায় না, দীর্ঘস্থায়ী (৮-১০ বছর ব্যবহার করা যায়)

লোহা বা জি.আই. নল/পাইপ দিয়ে শক্ত পোক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী (২০-২৫ বছর) অথবা বাঁশের সাহায্যে স্বল্প মূল্যের ছায়াজাল ঘরের কাঠামো তৈরি করা যায়। স্থায়ীত্ব বাড়াতে ব্যবহারের আগে বাঁশ আলকাতরা দিয়ে রঙ করে এবং গোড়ার এক মিটার ২০০ গেজের পলিথিনের ফিতা দিয়ে জড়িয়ে নিতে হবে।

সেডনেট বা ছায়াজালের ঘরের উপযোগীতা ঃ

১) সুরক্ষিত ভাবে ফসল চাষ করা যায় অর্থাৎ অতিরিক্ত সূর্যের আলো, তাপমাত্রা, অতিঠান্ডা, তীব্র বাতাস, অতি বৃষ্টি, শিশির, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি, অতিবেগুনী রশ্মির কুপ্রভাব এবং রোগ পোকা থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়। গাছের অতিরিক্ত শ্বসন নিয়ন্ত্রিত হয়। পাতার বাষ্পমোচন ও মাটির বাস্পীভবন কম হয়, চাষে জলের প্রয়োজন তুলনামূলক কমে যায়। জল ও সারের সঠিক ব্যবহার হয়। গাছ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় আলো পায়। এই পরিবেশে গাছের বৃদ্ধি ও বিকাশের প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা বজায় থাকে।

২) **অসময়ে (off season) ফসল চাষ করা যায় ঃ**

* গ্রীষ্মকালে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমাটো, ক্যাপসিকাম প্রভৃতি ফসল চাষ করা যাবে।
* শীত ও বসন্তকালে শশা, উচ্ছা, পটল, লাউ প্রভৃতি গ্রীষ্মকালীন ফসল চাষ করা যায়।
* সারা বছর ধরে ধনেপাতা, পালং, মূলো, জাতীয় ফসল চাষ করা যাবে।
* শীতকালে আরো নিশ্চিত ভাবে ব্রোকলি, সবুজ ও রঙিন ক্যাপসিকাম, লাল বাঁধাকপি, চীনা বাঁধাকপি, স্যাভয় বাঁধাকপি, কেল, চেরী টমাটো, ঘেরকিন, ব্রাসেলস, স্প্রাউটস প্রভৃতি অতিপুষ্টিকর দামী সব্জী চাষ করা যায়। ফসলের গুনগতমান ও ফলন অনেক বেশী হয়।

৩) ফুল ও সব্জীর উচ্চমানের নীরোগ চারা বছরের যে কোন সময় চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করা যায়।

৪) উচ্চমানের দামী ফুল- যেমন অর্কিড, গোলাপ, জারবেরা, এন্থুরিয়াম, র্কানেশন, চন্দ্রমল্লিকা প্রভৃতি ফুল নিশ্চিন্তে চাষ করা যায়।

৫) বীজ, কলম, টিসু কালচার এর মাধ্যমে সদ্য উৎপাদিত চারার সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য ছায়াজলের ঘরের প্রয়োজন হয়।

৬) বাহারী গাছের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য লাল রঙের ছায়াজালের ঘরের দরকার।

৭) ছায়াজাল দিয়ে তৈরী পান বরোজ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়, পানের ফলন ও মান ভাল হয়।

** এক নজরে ছায়াজালের ঘর তৈরীর প্রযুক্তি **

আয়তন ঃ লোহা বা জি.আই. পাইপ দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী ছায়া জালের ঘরের আয়তন কমপক্ষে ১০০০ বর্গ মিটার (১৫ কাঠা), এবং বাঁশ দিয়ে তৈরী ছায়াজালের ঘরের আয়তন কমপক্ষে ২০০ বর্গমিটার (৩ কাঠা) হওয়া বাঞ্ছনীয়।

উচ্চতা ঃ ৩.০ - ৩.৫০ মিটার (প্রায় ১০-১১ ফুট) তবে বাঁশের কাঠামোতে উচ্চতা ২.৪০-২.৭০ মি (৮-৯ ফুট)।

চূড়া ঃ সমান, অর্ধচন্দ্রাকৃতি, উল্টানো ইংরাজী ভি (/\) আকৃতি ইত্যাদি। ছায়াজাল দিয়ে ঢাকা কাঠামোর চার পাশে উপরের দিকে থেকে ৩০-৪৫ সে.মি. (এক-দেড় ফুট) বায়ু চলাচলের জন্য ফাঁকা না রেখে পোকা মাছি প্রতিরোধী জাল ব্যবহার করতে হয়, এবং কাঠামোর ভিতরের কার্বন ডাই অক্সাইড বেরিয়ে যাওয়া ঠেকানোর জনঞ কাঠামোর চার পাশে নীচের দিকে ৯০ সে.মি. (তিন ফুট) চওড়া কালো রঙের পলিথিনের চাদর দেওয়া হয়।

অবস্থান ঃ ভাল নিকাশী ব্যবস্থাযুক্ত এবং তীব্র বায়ু প্রবাহ থাকে না এমন জায়গায় শেডনেট ঘরের জন্য নির্বাচন করা যাবে। দক্ষিণ পশ্চিম দিকে সম্ভব হলে শেডনেট ঘরের চারপাশে সামান্য দূরে দ্রুতবর্ধনশীল বায়ুপ্রতিরোধী গাছ যেমন সুবাবুল, অড়হর, ভূট্টা ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে।

মাটি ঃ শোধন করা মাটি ব্যবহার করা আবশ্যক। সমান পরিমান মাটি ও জৈব সার (কেঁচো সার ও নিমখোল সহ হলে খুব ভাল হয়) নিতে হবে। সুপারিশ অনুযায়ী ফসল ভিত্তিক সার প্রয়োগ করা দরকার। মাটি থেকে কমপক্ষে ৩০-৪০ সে.মি. উঁচু এবং এক থেকে দেড় মিটার চওড়া বেড তৈরী করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৪৫-৫০ সে.মি. জল নিকাশী ও চলাফেরা করার জন্য ফাঁকা জায়গা রাখা প্রয়োজন।

সারিতে চাষ করতে হবে ঃ কিছু ফসল যেমন টমাটো, ক্যাপসিকাম, গোলাপ ইত্যাদি ঘন ভাবে রোপন করা হয়। গাছ উপরের দিকে বাড়ে। কাঠি, দড়ি, জি.আই. তার ব্যবহার করে গাছের অবলম্বনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ ঃ অনুসেচ ব্যবস্থার বিন্দু বিন্দু (ড্রিপ জলসেচ) পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক। ড্রিপের পাইপগুলি সারি বরাবর রাখতে হবে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে তরল সার প্রয়োগ (ফার্টিগেশন) করা যাবে। এই পদ্ধতি সম্ভব না হলে ঝারির সাহায্যে সেচ দিতে হবে।

ছায়া ঘরে (Shade Net) পান চাষ

গ্রামের পথে হাঁটতে গিয়ে খড়-বাঁশ-পাটকাঠি দিয়ে তিনদিকে ছাওয়া একখণ্ড জমি নজরে পড়েনি, এমনটা ভাবা যায় না। বিশেষত তা যদি দক্ষিণবঙ্গের কোনো গ্রাম হয়। ঠিকই ধরেছেন, পানের বরজের কথা বলছি। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পান চাষে শীর্ষস্থানে। দেশের মোট উৎপাদনের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ এ রাজ্যই জোগান দেয়।

উত্তরবঙ্গের তরাই ডুয়ার্স অঞ্চলেও অনেক পান বরজের দেখা মেলে। পানের পাতা যেহেতু সরাসরি চিবিয়ে খাওয়া হয়, সেজন্য এর স্বাদ, পাতার নরম ভাব, রং ইত্যাদি রক্ষা করতে চাষ করা হ য়। বরজের মধ্যে, রোদের তাপ, ঝোড়ো হাওয়া ও ঠান্ডার প্রকোপ থেকে পানকে বাঁচাতে উত্তরবঙ্গের ব্যাপক এলাকায় বাগানের নারকেল, সুপারি কিংবা আমগাছের সঙ্গে খোলা জায়গাতেও পান লাগানো হয়। পাতার ঝাঁঝ বেশি, পুরু, ছিবড়াযুক্ত। নাম 'গাছপান'। কিন্তু সাধারণ পান-রসিকদের পছন্দ বাংলা, সাঁচি, কাপুরি, নয়তো মিঠা পানের প্রাণ ভোলানো গন্ধ আর অপূর্ব স্বাদ।

ঠিক সেই কারণেই চাষি ভাইদের তৈরি করতে হয় বরজ। চারিদিকে বাঁশের খুঁটি পুঁতে তিন দিক ঢেকে তৈরি করা হয় প্যান্ডেলের আকারে। পাতাগুলি ঢাকা হয় পাটকাঠি দিয়ে, ওপরে ছাউনি বিছানো হয় খড় কিংবা ঘাস দিয়ে। ভেতরে সারি করে লাগানো হয় পানের পাতার কাটিং। লতিয়ে ওঠার জন্য মাটি থেকে বরজের মাথা ছুঁয়ে পোঁতা হয় বাঁশের কাঠি। এই কাঠি ধরে বাড়তে থাকে পানের লতা। বরজের মাথা ছুঁলেই নামিয়ে দেওয়া হয় মাটিতে। তারপর ওই লতা মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে ডগাটাকে বেঁধে দেওয়া হয় কাঠির সঙ্গে আবার বাড়ার জন্য। চাষী ভাইরা বরজের মধ্যে ঢুকে পানের পরিচর্যা করেন। পান বহুবর্ষজীবী, সেজন্য বারবার লাগানো দরকার হয় না। সারা বছর ধরে পানের পাতা তুলে বাজারে বিক্রি করে সংগ্রহ করেন সংসার চালানোর পুঁজি। এ যেন লক্ষ্মির ঝাঁপি।

কিন্তু সমস্যা দেখা যায় অন্যত্র। বাঁশ, পাটকাঠি, খড় দিয়ে তৈরি বরজ প্রকৃতির নিয়মেই কিছুদিনের মধ্যেই দুর্বল হয়, গোড়ায় উই ধরে, বাঁধন খুলে যায়, ঘুণ ধরে। সেজন্য ফসল নষ্ট হবার ভয়ে দরকার হয় নিয়মিত মেরামতি। এতে অনেক খরচ হয়। এরপর আসি ছাউনির কথায়। ওপরের খড়/ঘাসের ছাউনি পাতলা (ফাঁকা) বা ঘন করতে হয়। এতে আবার সেগুলি পরে গুঁড়ো হয়ে পানের বরজে পাতার ওপর পড়ে। বরজ নোংরা হয়। লোক লাগিয়ে বরজ/পাতা পরিষ্কার করতে হয়। পানের বরজ খড়, পাটকাঠি ইত্যাদি পচনশীল পদার্থ দিয়ে বানানো হয় বলে ভিতরের আর্দ্র পরিবেশে রোগপোকার আক্রমণ বাড়ে। এইসব সমস্যার সমাধানে এসেছে শেডনেটের সাহায্যে তৈরি বরজ পানের চাষ।

শেডনেট (ছায়াজাল) হল সিন্থেটিক জাল, যার মধ্যে অনেক ফুটো থাকে ;আলো হাওয়া চলাচলের জন্য। প্রয়োজনমতো এই ফুটো বড়, ছোট, ঘন বা পাতলা হয়। সেই মতো শেডনেটকে শতকরা হিসেবে ২৫ শতাংশ, ৫৩ শতাংশ, ৭৫ শতাংশ ইত্যাদি বলা হয়। পান চাষের জন্য ৫০ শতাংশ সবুজ রঙের শেডনেটই সবচেয়ে ভালো।

এই শেডের সাহায্যে বরজের তিনদিক ঢেকে দেওয়া হয়। বেশি হাওয়া চলাচলের জন্য প্রয়োজনমতো জাল কেটে জানালা তৈরি করা হয়। আর থাকে দরজা। অতিরিক্ত গরমের সময় এর মাধ্যমে ভেতরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। নেট টাঙানোর জন্য

শক্ত বাঁশের কাঠামো তৈরি করা হয়। তবে সবচেয়ে ভালো গ্যালভানাইজ্‌ড লোহার পাইপ দেখতে নীচু প্যান্ডেলের মতো লাগে। অর্থাৎ বরজের সবকিছুই রইল। শুধুমাত্র পরিবর্তন হল ছাউনির, বরজের চারিদিক এবং ভিতরের পাইপের খুঁটিগুলি সিমেন্টের বেদির ওপর বসানো হয়, যাতে সহজে ভেঙে না পড়ে। এর সাথে যোগ করা হয় জলসেচের জন্য অনুসেচের ব্যবস্থাপনা বরজের ভেতরে পাইপের সাহায্যে এটি বসানো হয়। এর ফলে পরিমিত অথচ নিয়মিত জলসেচ করা যায় পানগাছে। পাতাগুলোও ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। জল কম লাগে, আর মেশিনের সাহায্যে পরিচালিত হয় বলে জল দেওয়ার জন্য কোনো শ্রমিকও দরকার হয় না।

এই বরজ তৈরির প্রাথমিক খরচ কিছুটা বেশি হলেও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় ৮-১০ বছর রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলা থাকে না। প্রয়োজনমতো সামান্য মেরামতিতে আরও অনেকদিন চলে। বরজ পরিচ্ছন্ন থাকায় রোগপোকার আক্রমণও কম হয়। কাজেই কীটনাশকের প্রয়োজনও কম হয়। তাছাড়া কালবৈশাখী ঝড়, নিম্নচাপ শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রকৃতিক দুর্যোগে বরজ সহজে ভেঙে পড়ে না। ফলে ফসলহানি হয় না। কিছু কিছু জায়গায় বন্যপ্রাণীর আক্রমণ, বিশেষত গবাদি পশু ও হনুমানের দাপটে বরজ নষ্ট হয়। শেডনেটের মজবুত বরজে সেই ভয় অনেক কম থাকে।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, শেডনেটের বরজে উৎপন্ন পানের পাতা অনেক বড় হয় এবং উজ্জ্বল সবুজ রং পায়- তাই বাজারে বিক্রয়মূল্য বেশি। তাছাড়া এইভাবে যত্ন করার ফলে ফলনও বাড়ে।

তাই পুরোনো ধ্যানধারণা বদলে শেডনেটের তৈরি বরজ ফলদায়ী। অনেকেই প্রথমিকভাবে বেশি খরচের কথা ভাবেন। এবং সেটাই স্বাভাবিক। তবে আনন্দের কথা হল - এক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভর্তুকি মিলছে। উদ্যান পালন বা কৃষি দপ্তরে যোগযোগ করলেই কিছু তথ্য পাওয়া যাবে। জাতীয় উদ্যান মিশন প্রকল্পের অর্থানুকূল্যে প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গে শেডনেটের সাহায্যে তৈরি দীর্ঘস্থায়ী বরজ বিভিন্ন জেলায় হচ্ছে। বরজের মাপ সাধারণভাবে ৫০০ বর্গ মি. থেকে ১০০০ বর্গ মি. পর্যন্ত।

সহজ কথায়, শেডনেটের সাহায্যে তৈরি বরজ পানচাষের সুবিধাগগুলি হল-

১। বরজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকায় রোগপোকার আক্রমণ কম হয়।

২। পানের পাতা আকারে বড়, উজ্জ্বল রং হওয়ায় বাজারে চাহিদা বেশি।

৩। নিয়মিত আলো-হাওয়া চলাচলের কারণে গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়, স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

৪। মজুরির সাশ্রয় হয়। ফলন বেশি, তাই আয়ও বেশি।

৫। সারা বছর, এমনকি শীতকালেও পাতার ফলন ভালো পাওয়া যায়।

৬। বরজের গঠন মজবুত হওয়ায় ঝড়ে বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ভেঙে পড়ে ফসলহানি ঘটায় না।

৭। বন্যপ্রাণী বিশেষত হনুমানের তাণ্ডব ঠেকাতে পারে।

৮। রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কম, ৮-১০ বছর নিশ্চিন্তে থাকা যায়।

৯। জলসেচের জন্য জল কম লাগে। সেচ দেওয়ার জন্য আলাদা শ্রমিক লাগে না, জলের সঙ্গে সার মিশিয়ে দেওয়া যায়।

সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ভেষজ অধিকারের কার্য্যাবলী ঃ

দার্জিলিং জেলার মৎপুতে অর্কিডের বানিজ্যিক চাষের একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই কাজের জন্য উন্নত গুনমান সম্পন্ন অর্কিডের চারা বিলি করা হয়েছে।

দার্জিলিং জেলায় সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ভেষজ অধিকারের ৮৭ হেক্টর জমিতে কফির বাণিজ্যিক বাগিচা চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাণিজ্যিক প্রজাতির নতুন ধরনের সব্জী যেমন অ্যাসপারাগাস, ব্রকলি, সেলেরী, চেরী টমেটো, চীনা বাঁধাকপি, রঙিন ক্যাপসিকাম, পাক চয়, পার্সলে, লাল বাঁধাকপি, যুকিনি, ব্রাসেলস স্প্রাউটস, বিট, লিক, লেটুস, ইত্যাদি ও বাণিজ্যিক প্রজাতির নতুন ধরনের ফল যেমন নাসপাতি, কমলালেবু, কিউয়ি, পারসিমন, সংকর প্রজাতির লেবু (নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া) সংকর প্রজাতির আপেল (নিচু জায়গা), জাপানী পীচ, পিয়ার, অ্যাপ্রিকট, ওয়ালনাট, চেরী, চেষ্টনাট, কালোজাম, আলুবোখরা, মিসলা আপেল, ড্রাগন ফল ইত্যাদির বাণিজ্যিক চাষের উদ্যোগ এবং পুরোনো কমলালেবু বাগিচার পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে সিঙ্কোনা ও অন্যান্য ভেষজ অধিকারের উদ্যোগে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ঃ

আমাদের রাজ্য খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কৃষিজ ও উদ্যানজাত কাঁচামাল উৎপাদনে সামনের সারিতে থাকায়, কৃষিজ ও উদ্যানজাত পণ্যের উপযুক্ত ব্যবহার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর উপস্থিতির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের জীবনচর্যায়, গ্রামীন জীবিকা অর্জনে এবং অর্থনীতির বিকাশে এই শিল্পের প্রত্যক্ষ প্রভাব ক্রমবর্ধমান।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কৃষিজাত কাঁচা ফসলকে উপভোক্তাদের জন্য নিরাপদ, সুবিধাজনক, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য উপাদানে পরিবর্তিত করে। এই বহুমুখী শিল্প ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগ থেকে বহুজাতিক কোম্পানীগুলির মধ্যে বিস্তৃত। এই শিল্প খাদ্য শস্যের অপচয় ও পচন কমায়। এই রাজ্যের বৃহৎ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পগুলির মধ্যে রয়েছে চাল মিল, ডাল মিল, রাইসব্রান তেল, মাছ এবং ফলমূল ও শাকসব্জি প্রক্রিয়াকরণ, বেকারী ও কনফেকশনারী, ডেয়ারী (দুগ্ধজাত) এবং অন্যান্য ভোজ্য খাদ্যদ্রব্যাদির উৎপাদন। বিনিয়োগের বিভিন্ন সুগম পথ সৃষ্টি হওয়ায় স্বদেশ এবং বিদেশের বিনিয়োগকারীদের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ফলে আগামী দিনগুলিতে আরো বেশি বেশি করে এই শিল্পে বিনিয়োগ লক্ষ্য করা যাবে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অসীম সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে আশা করা যায় যে, কৃষি ও উদ্যানপালনজাত খাদ্য দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে এই শিল্পে প্রভূত অবদানের অধিকারী হতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প কৃষিজাত কাঁচা ফসলকে উপভোক্তাদের জন্য নিরাপদ, সুবিধাজনক, সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর খাদ্য উপাদানে পরিবর্তিত করে। এই বহুমুখী শিল্প ক্ষুদ্র এবং মাঝারি উদ্যোগ থেকে বহুজাতিক কোম্পানীগুলির মধ্যে বিস্তৃত। এই শিল্প খাদ্য শস্যের অপচয় ও পচন কমায়। ফলনোত্তর কৃষিজ পণ্যের যথাযথ ব্যবহার এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর প্রস্তুতি প্রত্যক্ষভাবে খামার মূল্য, গ্রামীণ আয় ও কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ঘটায়। এই শিল্প খাদ্য শস্যের অপচয় ছাড়াও উন্নত কারীগরী প্রযুক্তির সম্বন্বয়ে বাজারজাত করণের বিভিন্ন স্তরে সাহায্য করে। সেইজন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অর্থনীতিতে এবং কৃষকের জীবনচর্যায়, গ্রামীণ জীবিকা অর্জনে এই শিল্পের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

আমাদের রাজ্যে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রচুর পরিমানে রয়েছে। কৃষির অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামালের উৎপাদনের বিষয়টি একদিকে যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের প্রসারের পথটি সুগম করছে। এই লক্ষ্যে এই দপ্তর 'অংশগ্রহনমূলক কৃষির' শুরু করেছে, যেখানে 'শিল্পোদ্যোগী' এবং 'কৃষক উৎপাদক সংঘ' উভয়েই যুগপৎ লাভবান হবে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অসীম সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে আশা করা যায় যে, কৃষি ও উদ্যানপালনজাত খাদ্য দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে এই শিল্পে প্রভূত অবদানের অধিকারী হতে পারবে।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ অধিকারের লক্ষ্য ঃ

১। পচনশীল ফল-মূল, শাক-সব্জি, মাছ-মাংস এবং পোল্ট্রীজাত খাদ্য দ্রব্যের প্রক্রিয়াকরণের প্রবৃদ্ধি, অপচয় রোধ, যুক্তমূল্য বৃদ্ধির সুনিশ্চিত করণ করা।

২। নিরাপদ, স্বাস্থ্য সম্মত প্রক্রিয়াকৃত খাদ্য গৃহস্থালীর ও রপ্তানী বাজারের জন্য উৎপাদন এবং সরবরাহ করা।

৩। চাল, আলু, আনারস, শাকসব্জি এবং পোল্ট্রীজাত খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদনে দেশের মধ্যে অগ্রনীভূমিকা পালন করা এবং শাকসব্জী, ফলমূল ও সামুদ্রিক খাদ্য দ্রব্যাদি রপ্তানিকে নিয়ন্ত্রিত করা।

৪। কাঁচামালের যোগান ও বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নানা রকমের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের কাজে উৎসাহিত করা।

৫। উচ্চ কারিগরী প্রযুক্তির সহায়তায়, দেশের অগ্রনী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে খাদ্য প্রক্রিকরণ শিল্পে বিনিয়োগ করার জন্য আকৃষ্ট করা।

৬। এই শিল্পে সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

৭। এই শিল্পে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর উন্নতিসাধন করা— বিশেষ করে হিমায়িত শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে।

৮। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি নির্মানের কারখানা স্থাপনে উৎসাহিত করা।

৯। খাদ্য দ্রব্যের 'মানক' সুনিশ্চিত করার জন্য প্রধানত পি.পি.পি মডেলের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের পরীক্ষাগার পরিকাঠামো নির্মানের উন্নতি সাধন করা।

১০। শিল্প ও বাজারের নিরিখে কৃষিজ ফসলের উৎপাদনের বৈচিত্র্যের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দেওয়া, যাতে কৃষকের পছন্দের পরিবর্তে বাজারের প্রয়োজনের তাগিদেই কৃষিজ ফসল উৎপাদিত হয়।

কৃষিজ ও উদ্যানপালন ভিত্তিক প্রক্রিয়াজাত যে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করা যেতে পারে

ক্রমিক সংখ্যা	কাঁচামাল	মুখ্য উৎপাদক অঞ্চল	প্রক্রিয়াজাত খাদ্যবস্তু সামগ্রী
১)	ফল	মালদা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, নদীয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি	ক) জ্যাম / জেলি / চাটনী খ) শুকনো ফল গ) ক্যান / মোরব্বা ঘ) আচার / সস ঙ) জুস / চিপস ইত্যাদি
২)	সব্জী	মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া	ক) ক্যানড / প্যাকেট খ) সব্জীর স্যুপ / পাউডার/জুস গ) সব্জীর চাটনী / আচার ইত্যাদী ঘ) আই কিউ এফ সব্জী
৩)	কাজুবাদাম	পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	কাজু, কাজু বরফী, নোনতা খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি
৪)	নারকেল	পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা	শুকনো নারকেল, চিপস, নারকেল তৈল, নারকেল দুধ, নারকেলের ময়দা ইত্যাদি
৫)	শস্য (ক) ধান	সারা পশ্চিমবঙ্গ	চাল, মুড়ি, চিড়া, নুডুলস, ধানের তুঁষের তেল ইত্যাদি
	(খ) গম	মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান	আটা, ময়দা, সুজি, কেক, পাউরুটি, বেকারী দ্রব্য ইত্যাদি
	(গ) ডাল শস্য	পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ	বেসন, ছাতু, বড়ি ইত্যাদি
৬)	বাদাম	পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ	বাদাম তৈ তল, ময়দা, বাদাম ভাজা ইত্যাদি
৭)	মশলা	কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ	গুড়ো মশলা, পেষ্ট, শুকনো মশলা দ্রব্য সামগ্রী
৮)	মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ	উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর	ক) হিমায়িত গলদা চিংড়ি, খ) ক্যানড / হিমায়িত গ) আচার / পাপড় ঘ) স্যুপ পাউডার ইত্যাদি
৯)	দুধ প্রক্রিয়াকরণ	বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী	পাস্তুরাইজড দুধ, ঘি, মাখন, লস্যি, দই, চীজ, পনীর, শ্রীখন্দ, খোয়া ইত্যাদি
১০)	মাংস প্রক্রিয়াকরণ	বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ	ক্যানড / হিমায়িত প্রক্রিয়াকৃত মাংস

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প অধিকার নতুন নতুন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ সহায়তা প্রদান করে থাকে এবং রাজ্যে এই শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিতভাবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

১। প্রকল্প নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ।

২। প্রকল্পের অনুমোদন ও রূপায়নের কারীগরী সহায়তা প্রদান।

৩। কাঁচামালের লভ্যতা / প্রাপ্তির তথ্য প্রদান।

৪। উৎপাদিত পণ্যের বিপণন ও রপ্তানির যথাযথ তথ্য প্রদান।

৫। পণ্য উৎপাদনের উন্নতি সাধন এবং দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৬। যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনী উপকরণ প্রাপ্তির তথ্য ও দিশা প্রদান।

৭। বিদ্যমান প্রকল্পগুলির সম্প্রসারন / আধুনিকীকরণের জন্য সঠিক পথ প্রদর্শন।

৮। ২০১২-১৩ সালে এই রাজ্যে জেলা ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করা হয়েছে ও প্রকাশিত হয়েছে।

৯। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উপর ৮০টি 'আদর্শ প্রকল্প বিবরণী' তৈরী করা হয়েছে, যেটি ওয়েবসাইটে লিপিবদ্ধ আছে।

১০। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর 'জাতীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মিশনের' অধীনে ২০১২-১৩ থেকে ২০১৪-১৫ আর্থিক বর্ষে ৬৮টি প্রকল্পের জন্য ৩০.৫৬ কোটি টাকা অনুমোদন করেছিল, যার বিনিয়োগের পরিমান ৪৯৮.৩১ কোটি টাকা।

১১। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পগুলির মধ্যে চালকল, ডালকল, ধানের তুঁষের তেল কল, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, ফল ও শাকসব্জী প্রক্রিয়াকরণ, বেকারী ও কনফেকশ্নারী, দুগ্ধজাত খাদ্য, ভোজ্য তেল উৎপাদন প্রকল্পগুলি উল্লেখযোগ্য।

১২। অনুদানপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলি সন্তুষ্টজনকভাবে শুরু থেকে কাজ করে চলেছে এবং এই ৬৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ২৭৫৬ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে।

১৩। উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় মধু উৎপাদন কেন্দ্র (হানি হাব) গঠন করা হচ্ছে।

১৪। পশ্চিমবঙ্গে ভাটপাড়া, বীরনগর, নবদ্বীপ, রানাঘাট ও কাঁথি পৌরসভা এলাকায় কষাইখানা তৈয়ারীর জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। পূর্বেই কোলকাতা পৌর এলাকায় একটি কষাইখানা স্থাপনের জন্য কিছু পরিমান অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল।

১৫। বিভিন্ন জেলায় সেমিনার/কর্মশালা/উদ্যোগীদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়।

১৬। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে 'জয়নগরের মোয়া', 'বর্ধমানের মিহিদানা ও সীতাভোগ' ও 'বাংলার রসগোল্লা' জি. আই (জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) তকমা পেয়েছে।

প্রকল্প (সংক্ষিপ্ত) ঃ বেকারী এ্যান্ড কনফেকশনারী

১।	উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী	ঃ	পাউরুটি, কেক ইত্যাদি
২।	প্রস্তাবিত স্থান	ঃ	বর্ধমান, হাওড়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি।
৩।	কাঁচামালের লভ্যতা	ঃ	ক) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খ) সমগ্র ভারত
৪।	উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ	৬০০ মেট্রিক টন প্রতি বছর
৫।	বিনিয়োগ	ঃ	২.০ কোটি থেকে ২.৫ কোটি টাকা
৬।	প্রয়োজনীয় জমি	ঃ	০.৫ একর থেকে ১.০ একর
৭।	যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ	ঃ	২.০ কোটি থেকে ২.৫ কোটি টাকা
৮।	যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী	ঃ	এম্পায়ার প্রোডাক্টস, লুধীয়ানা গুডলাইফ টেকনোলজিস প্রাঃ লিঃ, নয়ডা প্রিতুল মেশিনস, উত্তর প্রদেশ
৯।	প্রয়োজনী ছাড়পত্র / লাইসেন্স	ঃ	দূষণ নিয়ন্ত্রন, এফ.এস.এস.এ.আই., উদ্যোগ আধার ইত্যাদি
১০।	পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ শিল্পকেন্দ্র	ঃ	বিস্কফার্ম, আনমোল বিস্কুট, রাজা বিস্কুট, তেরাই ফুডস
১১।	যোগযোগের তথ্যাদি	ঃ	ক) জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র খ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়ন আধিকারিক গ) ওয়েবসাইট - www.wbfpih.gov.in

প্রকল্প (সংক্ষিপ্ত) ঃ পটেটো ফ্লেক্স

১।	উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী	ঃ	পটেটো ফ্লেক্স / পাউডার
২।	প্রস্তাবিত স্থান	ঃ	হুগলি, বর্ধমান, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি
৩।	কাঁচামালের লভ্যতা	ঃ	ক) রাজ্য - হুগলি, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর খ) ভারত - উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, পাঞ্জাব
৪।	উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ	৬০০০ মেট্রিক টন প্রতি বছর
৫।	বিনিয়োগ	ঃ	১২.০ কোটি থেকে ১৫.০ কোটি টাকা
৬।	প্রয়োজনীয় জমি	ঃ	২.০ একর থেকে ৩.০ একর
৭।	যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ	ঃ	৭.০কোটি থেকে ৮.০ কোটি টাকা
৮।	যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী	ঃ	কিরেমকো বি. ভি., নেদারল্যান্ড বোনাঞ্জা ইনফ্রাস্ট্রাকচার (প্রাঃ) লিঃ, মুম্বাই উইনটেক টাপারিয়া লিঃ, পুনে
৯।	প্রয়োজনী ছাড়পত্র / লাইসেন্স	ঃ	দূষণ নিয়ন্ত্রন, এফ.এস.এস.এ.আই., উদ্যোগ আধার ইত্যাদি
১০।	পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ শিল্পকেন্দ্র	ঃ	ক্রাউন ফ্লেক্স (প্রাঃ) লিঃ
১১।	যোগযোগের তথ্যাদি	ঃ	ক) জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র খ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়ন আধিকারিক গ) ওয়েবসাইট - www.wbfpih.gov.in

প্রকল্প (সংক্ষিপ্ত) ঃ দুগ্ধজাত শিল্প

১।	উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী	ঃ	পাস্তুরাইজড দুধ, মাখন, পনির, লস্যি
২।	প্রস্তাবিত স্থান	ঃ	বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বাঁকুড়া
৩।	কাঁচামালের লভ্যতা	ঃ	ক) রাজ্য - বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, উত্তর চব্বিশ পরগণা, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর খ) ভারত - উত্তর প্রদেশ, বিহার, গুজরাট, পাঞ্জাব
৪।	উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ	৫০০০০ লিটার প্রতি দিন
৫।	বিনিয়োগ	ঃ	৫ কোটি থেকে ৬ কোটি টাকা
৬।	প্রয়োজনীয় জমি	ঃ	২.০ একর থেকে ৩.০ একর
৭।	যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ	ঃ	৪.০ কোটি থেকে ৪.৫ কোটি টাকা
৮।	যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী	ঃ	আই.ডি.এম.সি., গুজরাট ইউনিকর্ন ইন্ডাস্ট্রিজ, সেকান্দ্রাবাদ ডেয়ারী টেক ইন্ডিয়া, পুনে
৯।	প্রয়োজনী ছাড়পত্র / লাইসেন্স	ঃ	দূষণ নিয়ন্ত্রন, এফ.এস.এস.এ.আই., উদ্যোগ আধার ইত্যাদি
১০।	পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ শিল্পকেন্দ্র	ঃ	মেট্রো ডেয়ারী, রেড কাউ ডেয়ারী, এন.আর.এস. এ্যগ্রো, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ডেয়ারী এবং আরো অন্যান্য
১১।	যোগযোগের তথ্যাদি	ঃ	ক) জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র খ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়ন আধিকারিক গ) ওয়েবসাইট - www.wbfpih.gov.in

প্রকল্প (সংক্ষিপ্ত) ঃ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ

১।	উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী	ঃ	হিমায়িত চিংড়ি এবং অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ
২।	প্রস্তাবিত স্থান	ঃ	দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলাা
৩।	কাঁচামালের লভ্যতা	ঃ	ক) রাজ্য-উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব মেদিনীপুর খ) ভারত- উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ
৪।	উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ	৭০০০ মেট্রিক টন প্রতি বছর
৫।	বিনিয়োগ	ঃ	৮.০ কোটি থেকে ১০.০ কোটি টাকা
৬।	প্রয়োজনীয় জমি	ঃ	১.০ একর থেকে ১.৫ একর
৭।	যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ	ঃ	৪.০ কোটি থেকে ৫.০ কোটি টাকা
৮।	যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী	ঃ	শ্রী সাই টেক রেফ্রীজারেশন প্রাঃ লিঃ কোলকাতা রেফ্রীজারেশন পাতিলস'ইন্ডস্ট্রী এন্ড রেফ্রীজারেশন রাইন্যাক ইন্ডিয়া
৯।	প্রয়োজনী ছাড়পত্র / লাইসেন্স	ঃ	দূষণ নিয়ন্ত্রন এফ.এস.এস.এ.আই. উদ্যোগ আধার ইত্যাদি
১০।	পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ শিল্পকেন্দ্র	ঃ	এস.এ. এক্সপোর্ট এসেক্স মেরিন (প্রাঃ) লিঃ দিঘা সি ফুড (প্রাঃ) লিঃ কে. এন.সি. এগ্রো লিঃ
১১।	যোগযোগের তথ্যাদি	ঃ	ক) জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র খ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়ন আধিকারিক গ) ওয়েবসাইট - www.wbfpih.gov.in

প্রকল্প (সংক্ষিপ্ত) ঃ রাইস মিল বা চাল কল

১।	উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী	ঃ	রাইস বা চাল, রাইস ব্রাণ
২।	প্রস্তাবিত স্থান	ঃ	বর্ধমান, হুগলী, বাঁকুড়া, মালদহ, পশ্চিম মেদিনীপুর
৩।	কাঁচামালের লভ্যতা	ঃ	ক) রাজ্য -বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ খ) ভারত - বিহার, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়, উড়িষ্যা
৪।	উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ	৬ মেট্রিক টন প্রতি ঘন্টা
৫।	বিনিয়োগ	ঃ	৭.০ কোটি থেকে ৮.০ কোটি টাকা
৬।	প্রয়োজনীয় জমি	ঃ	১.০ একর থেকে ২.০ একর
৭।	যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ	ঃ	৪.০ কোটি থেকে ৫.০ কোটি টাকা
৮।	যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী	ঃ	বুলার (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড সাতাকে ইন্ডিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং প্রাঃ লিঃ জি.জি.ডানডেকার মেসিন ওয়ার্কস লিঃ মিলটেক মেসিনারি প্রাঃ লিঃ
৯।	প্রয়োজনী ছাড়পত্র / লাইসেন্স	ঃ	দূষণ নিয়ন্ত্রন, এফ.এস.এস.এ.আই., উদ্যোগ আধারইত্যাদি
১০।	পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ শিল্পকেন্দ্র	ঃ	শিব ইন্ডাস্ট্রিজ (ফুড) প্রাঃ লিঃ, মজুমদার এ্যগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ, ভদ্রেশ্বর রাইস মিল এবং আরো অন্যান্য
১১।	যোগযোগের তথ্যাদি	ঃ	ক) জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র খ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়ন আধিকারিক গ) ওয়েবসাইট - www.wbfpih.gov.in

প্রকল্প (সংক্ষিপ্ত) ঃ রাইসব্রান তেল

১।	উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী	ঃ	রাইসব্রান তেল (ক্রুড), ডে অয়েল্ড রাইসব্রান কেক
২।	প্রস্তাবিত স্থান	ঃ	হুগলি, বর্ধমান, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর
৩।	কাঁচামালের লভ্যতা	ঃ	ক) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খ) সমগ্র ভারত গ) আমদানি - বাংলাদেশ
৪।	উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ	৫০০০০ মেট্রিক টন প্রতি বছর
৫।	বিনিয়োগ	ঃ	৭.০ কোটি থেকে ৮.০ কোটি টাকা
৬।	প্রয়োজনীয় জমি	ঃ	১.৫ একর থেকে ২.০ একর
৭।	যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ	ঃ	৪.০ কোটি থেকে ৫.০ কোটি টাকা
৮।	যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী	ঃ	এগ্রোকেম ইঞ্জিনিয়ার্স সানডেক প্রসেস ইঞ্জিনিয়ার্স (প্রাঃ লিঃ, কুমার মেটাল ইন্ডাস্ট্রীজ (প্রাঃ) লিঃ
৯।	প্রয়োজনী ছাড়পত্র / লাইসেন্স	ঃ	দূষণ নিয়ন্ত্রন, এফ.এস.এস.এ.আই., উদ্যোগ আধার , ফায়ার এ্যান্ড হ্যাজার্ডস লাইসেন্স ইত্যাদি
১০।	পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ শিল্পকেন্দ্র	ঃ	কল্যাণী সলভেক্স (প্রাঃ) লিঃ, সুকুমার সলভেন্টস (প্রাঃ) লিঃ
১১।	যোগযোগের তথ্যাদি	ঃ	ক) জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র খ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়ন আধিকারিক গ) ওয়েবসাইট - www.wbfpi.gov.in

প্রকল্প (সংক্ষিপ্ত) ঃ ফ্লাওয়ার মিল

১।	উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী	ঃ	আটা, ময়দা, ডালিয়া ইত্যাদি
২।	প্রস্তাবিত স্থান	ঃ	হুগলি, বর্ধমান, হাওড়া, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি
৩।	কাঁচামালের লভ্যতা	ঃ	ক) রাজ্য - পাবলিক ডিস্টিবিউশন সিস্টেম খ) ভারত - উত্তর প্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, হরিয়ানা গ) আমদানি - অস্ট্রেলীয়া, ইউক্রেন, রাশিয়া
৪।	উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ	৪৮০০০ টন প্রতি বছর
৫।	বিনিয়োগ	ঃ	১০.০ কোটি থেকে ১২.০ কোটি টাকা
৬।	প্রয়োজনীয় জমি	ঃ	২.০ একর থেকে ৩.০ একর
৭।	যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ	ঃ	৪.৫ কোটি থেকে ৫.০ কোটি টাকা
৮।	যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী	ঃ	ফ্লাওয়ারটেক ইঞ্জিনিয়ার্স, ফরিদাবাদ ইন্দোপোল ফুড প্রসেসিং, ফরিদাবাদ ফেবকন (ইন্ডিয়া), হাওড়া
৯।	প্রয়োজনী ছাড়পত্র / লাইসেন্স	ঃ	দূষণ নিয়ন্ত্রন, এফ.এস.এস.এ.আই., উদ্যোগ আধার ইত্যাদি
১০।	পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ শিল্পকেন্দ্র	ঃ	অঙ্কিত ফ্লাওয়ার মিল, সাকাম্বারি ফ্লাওয়ার মিল, গীতাদেবী ফ্লাওয়ার মিল এবং আরো অন্যান্য
১১।	যোগযোগের তথ্যাদি	ঃ	ক) জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র খ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়ন আধিকারিক গ) ওয়েবসাইট - www.wbfpih.gov.in

প্রকল্প (সংক্ষিপ্ত) ঃ ডাল মিল

১।	উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী	ঃ	মুসুর ডাল, মুগ ডাল, মটর ডাল ইত্যাদি
২।	প্রস্তাবিত স্থান	ঃ	পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা
৩।	কাঁচামালের লভ্যতা	ঃ	ক) রাজ্য - বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর খ) ভারত - মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং অন্ধ্রপ্রদেশ গ) আমদানি - মুসুর ডাল ও মুগ ডাল- কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান, মোজাম্বিক, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার ইত্যাদি, মটর ডাল -নেপাল
৪।	উৎপাদন ক্ষমতা	ঃ	১০০০০ মেট্রিক টন প্রতি বছর
৫।	বিনিয়োগ	ঃ	২.৫ কোটি থেকে ৩ কোটি টাকা
৬।	প্রয়োজনীয় জমি	ঃ	০.৫ একর থেকে ১.০ একর
৭।	যন্ত্রপাতি বিনিয়োগ	ঃ	১.০ কোটি থেকে ১.৫ কোটি টাকা
৮।	যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী	ঃ	কিষাণ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, নিউ দিল্লী এস কে ইঞ্জিনিয়ারিং এ্যান্ড অ্যালায়েড ওয়ার্কস, উত্তর প্রদেশ। যশ এন্টারপ্রাইজ, আমেদাবাদ, গুজরাট। পাডসন্স ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিঃ। বশিষ্ঠ ফুড অ্যাসোসিয়েট।
	(স্থানীয় বাজার থেকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সংগ্রহ করা যেতে পারে)		
৯।	প্রয়োজনী ছাড়পত্র / লাইসেন্স	ঃ	দূষণ নিয়ন্ত্রন, এফ.এস.এস.এ.আই., উদ্যোগ আধার ইত্যাদি
১০।	পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ শিল্পকেন্দ্র	ঃ	সূর্যোদয় এডিবেলস (ইন্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ প্রসপারিটি বাণিজ্য (প্রাঃ) লিঃ ইত্যাদি
১১।	যোগযোগের তথ্যাদি	ঃ	ক) জেনারেল ম্যানেজার, জেলা শিল্পকেন্দ্র খ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়ন আধিকারিক গ) ওয়েবসাইট - www.wbfpih.gov.in